সাহস শক্তি সক্রিয়তা

হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

পূজা সংখ্যা আশ্বিন, ১৪২০, ৪ঠা অক্টোবর ২০১৩

স্বদেশ

সংহতি সংবাদ

সাহস ✪ শক্তি ✪ সক্রিয়তা

বিশেষ পূজা সংখ্যা ২০১৩ (আশ্বিন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ)

হিন্দু সংহতি

সম্পাদক
বিকর্ণ নস্কর

প্রকাশক ও মুদ্রক
তপন কুমার ঘোষ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা-৭০০০১২
ফোন ঃ ০৩৩ ৬৫৩৫ ৩৪৭৪

মুদ্রণে
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬

প্রাপ্তিস্থান
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

ইন্টারনেটে হিন্দুসংহতি
<www.hindusamhati.org>,
<www.hindusamhatitv.blogspot.in>,
<southbengalherald.blogspot.com>,
Email : hindusamhati@gmail.com

বাণী

"অবস্থা অনুযায়ী সাম-দান-দণ্ড-ভেদ এই চতুর্বিধ নীতি প্রয়োগ কর, শত্রুজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধ কর, পৃথিবী ভোগ কর—তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবনযাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরকালেও তাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সূচীপত্র

আমাদের কথা		২
জ্যান্ত দুর্গা	কার্ত্তিক দত্ত	৩
বিজয়া ও বাঙালির ঐতিহ্য	তপন ঘোষ	৫
হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চাই		৭
হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে প্রথম আহ্বান		৮
রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ	স্বামী বিবেকানন্দ	৯
বুনো রামনাথের গল্প	পুনঃমুদ্রণ	১০
মুসলমানের ভারত বিজয়	উইল ডুরান্ট	১৩
পত্রিকা দপ্তর থেকে ঃ বিভিন্ন সংবাদ		১৬

আমাদের কথা

শংকরাচার্যকে মিথ্যা অপবাদে গ্রেপ্তারের কথা শুনে মিডিয়ার উল্লাস, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিশিষ্টজনদের নিয়ে তর্ক-বিতর্কের আড্ডা বসে। তখন আশ্চর্যভাবে নীরব থাকে সমস্ত রাজনৈতিক দল, কেউ কেউ আবার ভাবে যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। কখনো রামদেবের গায়ে কাদা ছেটাতে টিভি-র প্রথম সারির চ্যানেলে সান্ধ্য মজলিস বসে, তখনও দেখি রাজনৈতিক দলেরা চুপ। আশারাম বাপুকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করার খেলায় মত্ত প্রশাসন—তখন নীরব সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা ও ধর্মগুরু। এতে তাদের সেক্যুলার চরিত্রটা বজায় থাকে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে নিজের সেক্যুলার ভাবমূর্তিটা বজায় রাখতে রাজনীতির নেতা থেকে শুরু করে ধর্মগুরু, বুদ্ধিজীবী বা বিশিষ্ট সুশীল সমাজ সদা সচেষ্টা।

কিন্তু আমরা যখন শুনি ইমাম বুখারির নামে কোন অনৈতিক কাজে কেস আছে কিংবা কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের প্রধান ইমাম বরকতি যখন প্রকাশ্যে তসলিমা নাসরিনকে হত্যা করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন—তখন পুলিশ প্রশাসন তাদের গ্রেপ্তারের জন্য সচেষ্ট হয় না কেন? রাজনৈতিক নেতারা তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না কেন? মিডিয়ায় ফলাও করে খবর ছাপে না কেন বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া তর্ক-বিতর্কের আড্ডা বসায় না কেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে এরা সকলে মুসলমানের হয়ে ওকালতি করছে? না কি কোন না কোন রাজনৈতিক দলের দালালি করে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত সুশীল সমাজ। ইমাম বুখারি, ইমাম বরকতি কিংবা তোহা সিদ্দিকির বিরুদ্ধে কিছু বললে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে। কিংবা তসলিমা কাণ্ডের মতো একটা ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে। তাই সকলে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। অথচ হিন্দু ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে তির্যক মন্তব্য করতে তাদের মুখে বাধে না। এতে অবশ্য তাদের সেক্যুলার চরিত্র মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

দেশে তো অনেক হিন্দু সংগঠন আছে। আছে অনেক হিন্দু ধর্মগুরু যাদের কুম্ভমেলায় বা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেখা যায়। কিন্তু তারা কেন শংকরাচার্য, রামদেব বা আশারাম বাপু'র প্রতি এই হীন চক্রান্তে প্রতিবাদী হচ্ছে না? কিন্তু কেন? ভয়? নাকি স্বার্থ? কেন নিশ্চুপ হয়ে আছে তারা? জনৈক এক ধর্মগুরুর বক্তব্য, অধিকাংশই হিন্দু সংগঠন আছে নখ-দাঁতহীন নির্বীর্য হয়ে পড়েছে। আর হিন্দু ধর্মগুরুরা নিজেদের পেট পুজোতেই অনেক বেশি ব্যস্ত। অনেকেতো আবার পেট্ (Pet) হয়ে গেছেন রাজনৈতিক দলের।

তাই দেখি, হিন্দু ধর্মগুরুরা বারবার অন্যায়ের শিকার হলেও হিন্দু সমাজ নীরবে তাদের অপমানকে মেনে নিচ্ছে। কোথাও প্রতিবাদের ঝড় উঠছে না। মিডিয়া বা বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদ তো করেই না, উল্টে রসজ্ঞ আলোচনায় মেতে ওঠে। আর এটা তারা করেন অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে। কিন্তু মুসলিম ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠলে এরা আর রা- কাড়েন না। উল্টে বিষয়টির মধ্যে তারা দূরভিসন্ধি খুঁজে পান। লন্ডনের একটি পত্রিকায় মুসলিম ধর্মগুরুকে নিয়ে একটি লেখা বেরিয়েছিল, যা স্টেটসম্যান পত্রিকা পুনর্মুদ্রণ করে। এরপর তিনদিন ধরে মুসলিমরা স্টেটসম্যান পত্রিকা অফিসে ভাঙচুর চালায়। অন্যান্য পত্রিকাগুলো এই ঘটনার প্রতিবাদ না করে নীরব রইল, বুদ্ধিজীবীরা স্টেটসম্যান পত্রিকায় দায়ী করলো। প্রশাসন পত্রিকা সম্পাদককে গ্রেপ্তার করলো। কেন? মুসলিম সমাজকে সন্তুষ্ট করতে। মুসলিমরা সন্তুষ্ট হলে ভোটব্যাঙ্ক বজায় থাকে, মুসলিমরা সন্তুষ্ট হলে সেক্যুলার অবস্থা বজায় থাকে। মুসলিমদের অন্যায়-অত্যাচারকে মেনে নিয়ে দেশে অচল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করে রেখেছে। হায়রে আমার দুর্ভাগা দেশের নেতা-মন্ত্রীরা—এ কোথায় নিয়ে চলেছেন দেশটাকে আপনারা।

তাই দেখা যায় যে, হিন্দু ধর্মগুরুদের মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর মুসলমানদের তোষণ করা মিডিয়া-রাজনৈতিক দলগুলোর এক মহৎ কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাই কি তাহলে মিডিয়া ও রাজনৈতিক দলগুলোর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষণ? এটাই কি ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির চূড়ান্ত নমুনা? অনেকদিন পরে কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করি, কি রে কেমন আছিস? বন্ধুটি উত্তর দেয়, না মরে বেঁচে আছি। হিন্দু সমাজও কি তবে সেইরকম হয়ে গেল। তারা তাদের দেশেই না মরে বেঁচে আছে। কেন সমগ্র হিন্দু সমাজ এই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে না? কেন তারা বুঝতে পারছে না দেশের ভাগ্য নির্ধারণে তাদের ভোটের মূল্য কতখানি? পূর্বাশার দ্বার খুলে তারা আবার নতুন সূর্যের ভোর আনতে পারে। এরজন্য চাই হিন্দু জনজাগরণ ও আত্মবিশ্বাস। হিন্দু সংহতি হিন্দুদের মধ্যে এই কাজটাই করে চলেছে।

জ্যান্ত দুর্গা

কার্ত্তিক দত্ত

অসুরকূল সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, অশুভশক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে সমস্ত শুভশক্তিকে, তখন সমস্ত প্রলয় ঠেকাতে আর দুষ্ট আসুরিক শক্তি বিনষ্ট করতে বিশ্বে আবির্ভূত হলেন মহামায়া। সমস্ত রকম দুর্গতি থেকে রক্ষা করতে এলেন শক্তিস্বরূপিণী দেবী দুর্গা। আজ গোটা ভারতবর্ষ তথা আমার বাংলায় কালো ছায়া ফেলেছে একটি অশুভশক্তি, যে তার সর্বগ্রাসী জিহ্বা দিয়ে গ্রাস করছে হিন্দুধর্মের সব কিছু। হিন্দুর মা-বোন-দুর্গা-কালি-সরস্বতী। থাকার জায়গা-বাঁচার জায়গা-সম্মানের জায়গা-কাশ্মীর-দেগঙ্গা-নলিয়াখালি-কামদুনি। আর আমাদের সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ, প্রশাসন সর্বংসহা। আমাদের সরকার পুরাণের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্রদের মত অবস্থা। কারণ এনাদের বর লাভ করেই অসুরকূল এতো শক্তিশালী হয়েছিল। সে রকম আমাদের প্রশাসন একটি অশুভশক্তির মেকী সাধনায় তুষ্ট হয়ে এদেরকে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী করে তুলছে। আর পুরাকাল থেকে আমরা জেনেছি অসুররা যখনই বেশি শক্তিশালী হয়েছিল তখনই দেবতারা

অসহায় হয়ে পড়েছিল। যেমন করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্ররা মহিষাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রিফিউজি হয়েছিল। তারপর তারা যখন শক্তির আরাধনা করে বা সম্মিলিত শক্তি দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে দেবী দুর্গাকে মহিষাসুর বধ করতে পাঠালেন, মা দুর্গা অসুর বধ করে দেবতাদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিলেন, তখন দেবতারা পুনরায় স্বর্গে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। আজ এই শক্তিস্বরূপিণী দেবী দুর্গার অভাব পড়ে গিয়েছে। আর রক্তবীজের ঝাড় অসুরশক্তি বেড়েই চলেছে।

দুর্গা ও শক্তি এই শব্দ দুটি দিয়ে একটি নাম মনে পড়ে গেল। নামটা হল দুর্গাশক্তি (নাগপাল)। যে নামটা নাম মাত্র নয়। যিনি নামেও দুর্গা কাজেও দুর্গা। পশ্চিমবাংলার পাশেই অবস্থিত ঝাড়খন্ডের ভূমিকন্যা দুর্গাশক্তি নাগপাল। যার কথা গত কয়েকমাস ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, যে কিছুটা হলেও নাড়া দিয়েছিল এদেশের দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনতন্ত্র তথা সন্ত্রাসী শক্তির কিছু স্তম্ভকে। ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (আই.এ.এস.)-এর এক কনিষ্ঠ সদস্যার ভিতর আবিষ্কৃত হয়েছে সেই সাহসিকাকে যিনিই দুর্গাশক্তি। যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র ভয় পাননি। আর এই অসম সাহসিকতার জন্য যার উপর নেমে এসেছে সাসপেনশনের খাঁড়া।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত এই আধিকারিক উত্তর প্রদেশের নয়ডা জেলার একজন মহকুমা শাসক। যে বিষয়টা নিয়ে প্রধান বিতর্ক সেটি হল—উনি নাকি রমজান (পবিত্র) মাসে গ্রেটার নয়ডার কদলপুর গ্রামে অবস্থিত একটি বেআইনি নির্মীয়মান মসজিদের পাঁচিল ভাঙার তদারকি করেছেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই কাজ করার জন্য সংখ্যালঘু (মুসলিম)-দের মনে বড় কষ্ট দিয়েছেন! সাথে সাথে অখিলেশ সরকার ও তার বাবার। কারণ দুর্গা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করেছেন। তাই অখিলেশ সরকার দুর্গার পিছনে আদাজল খেয়ে লেগে গেল। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সারাদেশে ছড়িয়ে যেতে পারত, এমত অবস্থায় কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায়! সরকারকে তো কিছু কাজ দেখাতে হবে। তাই দুর্গার উপর নেমে এল আসুরিক শক্তির খাঁড়া। তাঁকে গত ২৮ জুলাই পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হল। এমনকি উত্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব ও উত্তরপ্রদেশের জনতার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এই সরকারি ফতোয়ার পক্ষে নানা সাফাই গেয়েছেন নিত্যদিন। রাজ্যের অন্তত দুইজন মন্ত্রী আজম খান ও নারায়ণ ভাট্টি বলেছেন— 'সংবাদ মাধ্যমগুলি দুর্গাশক্তিকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করছে। অফিসারদের সাসপেন্ড করা এ আর নতুন ঘটনা কি? সারা দেশ জুড়ে তো কত অফিসার সাময়িক বরখাস্তের পরোয়ানা পাচ্ছে তার বেলায় মিডিয়া চুপ কেন?'

শুধু তাই নয়, এই আঠাশ বছরের, একরোখা তেজস্বিনী দুর্গাটি যমুনা ও হিন্দন নদী থেকে বেআইনি ভাবে বালি তুলে নিয়ে কোটি কোটি টাকার অবৈধ বাণিজ্য করে। যে সব মাফিয়া, তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আঘাত হেনেছেন। সেইজন্য দুর্গা এদের বন্দুকের টার্গেট হয়েছিল। এমন কি তার উপর হামলাও হয়। শক্তিস্বরূপিণী পিছু হটেননি। কিন্তু রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দুর্নীতিবাজরা দুর্গার পিছু ছাড়েনি। অসুররা ঘুমায়না। ওত পেতে বসেছিল দুষ্ট প্রহরীরর মত ছলে বলে কৌশলে দুর্গাকে জব্দ করার জন্য। তাই দুর্গার মাথায় নেমে আসে খড়্গ।

হে আমার বাংলার মা! তোমার আকাশে আজ কালো মেঘ জমাট বেঁধেছে। শত্রুর অস্ত্রে ঝলকানি দিচ্ছে বিদ্যুৎ। ওদের অট্টহাসিতে কেঁপে উঠেছে ভারতের মাটি, সোনার বাংলা। বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ আগ্রাসী সন্ত্রাসী শক্তির আগুনের জিহ্বা। রসা-তারানগর-রূপনগর-দেগঙ্গা- নলিয়াখালিতে আমার পোড়া ঘরের ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আমার বোনের রক্তে পিচ্ছিল গেদে-গাইঘাটা-কামদুনির মেঠোপথ। তালতলা-মানিকতলার অলিতে গলিতে আমাদের ধর্মস্থান দখলের নিষ্ঠুর থাবা।

আমাদের সব হারানোর পর লাল-সবুজের শব্দভেদী সাইরেন। সমস্ত রকম অশান্তির শেষে শান্তি রক্ষক এসে দাঁড়াবেন, শোনাবেন সম্প্রীতির ললিতবাণী।

কেন বারংবার এই ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে? মা আজ তোমার খুব প্রয়োজন। তুমি জাগো মা। তুমি দশপ্রহরণধারিণী। তুমি সিংহবাহিনী। তুমি জগৎজননী। তুমি রণচণ্ডী। তুমি মুণ্ডমালিনী। তুমি অসুরদলনী। তুমি সহস্র সর্পবিষধারিণী। তুমি দুর্গা, তুমি কালী। তুমি অবতীর্ণ হও বাংলার বুকে। সুরলোকে বাজে শঙ্খ। বাংলার বুকে বাজে যুদ্ধের দামামা। তুমি জাগো মা। তুমি বল মা...'ফুল মালা চন্দনে পূজা নিবনাকো আর/ সংকল্প করিতে হইবে এবার অসুরে বধিবার।'

হিন্দু সংহতি-র পক্ষ থেকে সকলকে জানাই
শুভ বিজয়াদশমী ও দীপাবলির
জাতীয়তাবাদী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ঁ বিজয়া ও বাঙালির ঐতিহ্য

তপন ঘোষ

গ্রামের বাঙালি হিন্দু মনে করে বিজয়া মানে মা দুগ্গার বিসর্জন। শহরের বাঙালি মনে করে বিজয়া মানে সামাজিক প্রথা - পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়। ছোটরা মনে করে বিজয়া মানে বড়দেরকেপ্রণাম করে নারকেল নাড়ু বা মিষ্টি খাওয়া। সব মিলিয়ে বিজয়া মানে একটা উৎসব, আনন্দ, হৈ হৈ। আর এই সব হবে মা দুগ্গাকে জলে ভাসানোর পর। আচ্ছা, মা দুর্গাকে তো বাঙালি ঘরের মেয়ে মনে করে। বৎসরান্তে তার বাপের বাড়িতে আসা। আমরা তার বাপের বাড়ির লোকজন। তাই তার আসা উপলক্ষে আমাদের এত আনন্দ। সেই মেয়ে চারদিনের ছুটির শেষে আবার যখন তার পতিগৃহে ফিরে যাচ্ছে, আবার এক বছর তার দেখা পাবোনা, চোখের জলে আমরা তাকে বিদায় দিচ্ছি, ঠিক তার পরেই এত আনন্দ -উৎসব, এত মিষ্টি খাওয়া হিসাবে মেলে কি? ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে না? আর এর নাম বিজয়া-ই বা কেন? কোনো অভিধানে কি পাওয়া যাবে বিসর্জন বা বিদায় শব্দের সঙ্গে বিজয় শব্দটির কোন সম্বন্ধ আছে? তাহলে মা দুর্গাকে যখন চোখের জলে বিদায় দিচ্ছি ঠিক তার পরেই বিজয়া শব্দটাই বা এল কি করে, আর আনন্দ উৎসবই বা কেন?

আহা, বাঙালি যদি এর কারণটা জানত, তাহলে আজ বাংলার চেহারাটাই অন্য রকম হত। শুধু এ বাংলাটাই নয়, ও বাংলাটাও। বাংলার বাইরে অনেকে প্রশ্ন করে— দুর্গাপূজা বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব, এই উৎসবে বাঙালি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ভেসে যায়। তাহলে বাংলায় নাস্তিক কম্যুনিষ্টদের এত প্রভাব কেন? দুর্গা-কালী ভক্ত এই বাংলায় অধার্মিক কম্যুনিষ্টরা কি করে ৩০ বছর ধরে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে? বিজয়ার প্রশ্ন, আর এই কম্যুনিষ্ট প্রশ্ন - দুটো প্রশ্নেরই উত্তর এই যে বাঙালি পুজো করে আর বিজয়া করে, দুটোই না বুঝে। তাই দুর্গাপূজাকে বছরের বৃহত্তম উৎসব হিসাবে নিয়েও সম্পূর্ণ পূজা বিরোধী কম্যুনিষ্ট পার্টির ঝান্ডা ধরতে ভোট দিতে বাঙালির কোনো অসুবিধা হয়না। এটা কি বাঙালির আত্মপ্রবঞ্চনা, দুমুখো সুবিধাবাদী নীতি? অনেকটা, সবটা নয়। অজ্ঞতাও বটে। সুবিধাবাদী নীতি ও অজ্ঞতার যোগফল। অজ্ঞতাটা কী? ধর্ম সম্বন্ধে না জানা। বিজয়া সম্বন্ধে না জানা। না জেনে পালন করা। জানলে হয়তো করত না । কী করত না? হয় ধর্ম করত না, অথবা কম্যুনিজম করত না।

কারণ ধর্ম করে মার্কসবাদ করা যায় না এবং মার্কসবাদ করে ধর্ম করা যায় না। এই অজ্ঞানতা যদি আরও দীর্ঘদিন চলে, তাহলে কোনদিন হয়ত দেখব মা দুর্গার পিছনের চালিতে মাথার উপর যেখানে শিবের ছবি থাকে, সেখানে মার্কসের ছবি ঢুকে গেছে। তখন কে বেশি অসন্তুষ্ট হবে মার্কস না মা দুর্গা - বলা কঠিন।

এখন আসা যাক বিজয়ার প্রশ্নটাতে। বিদায়, বিসর্জন, গঙ্গার ধারে আঁখি ছলোছলো, তার সঙ্গে মিষ্টি খাওয়া, শুভেচ্ছার কোলাকুলি, পোস্টকার্ড, গ্রিটিংস কার্ড, SMS-এর মিল কোথায়? এর উত্তরটা ভালোভাবে দেওয়া যাক। বহুদিক থেকেই এই উত্তরটা গুরুত্বপূর্ণ ।

এই উত্তরটা ভালোভাবে জানতে গেলে এর সঙ্গে জড়িত আর একটা প্রথার ব্যাপারে জানতে হবে। তা হল বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জনের আগে সধবা মহিলাদের সিঁদুর খেলা। এই সিঁদুর খেলার সঙ্গে বিজয়ার প্রণাম, কোলাকুলি, মিষ্টি খাওয়া অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ।

আসা যাক উত্তরে। মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে মহিষরূপী মহিষাসুর বধ করলেন মা দুর্গা। সেখান থেকে দৈত্য রূপ নিয়ে বেরিয়ে এল ঐ অসুর। নবমী তিথিতে তাকে বধ করলেন মা দুর্গা। বিজয় লাভ সম্পূর্ণ হল। তাই দশমীতে পালন হল বিজয় উৎসব, নাম যার বিজয়া বা বিজয়া দশমী। এই ঘটনা ঘটেছিলো সত্য যুগে। কোন এক বসন্ত কালে। এল ত্রেতা যুগ। অধার্মিক অত্যাচারী পরনারীহরণকারী রাবণকে ধ্বংস করার জন্য রামচন্দ্র দেবী দুর্গার পূজার আয়োজন করলেন। সে সময় বসন্ত কাল ছিল না। কিন্তু রামের হাতে সময় নেই। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তাই শরৎকালে অকালেই দেবীর পূজা করলেন। সেইজন্য এই পূজার আর এক নাম 'দেবীর অকালবোধন'। যুদ্ধে রাবণ বধ হল। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে দেবী দুর্গার আরাধনা করলে যুদ্ধে জয় লাভ হয়। তাই বিজয়াদশমী শুধু বিজয়লাভের জন্য উৎসবই নয়, ওই দিনটা জয়লাভের জন্য, যুদ্ধ শুরু করার জন্য একটা শুভ দিন পবিত্র দিন হিসাবেও গণ্য হতে লাগল। সুতরাং ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে ওই দিনটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠলো। বিজিগীষু রাজারা তাঁদের রাজ্যের সীমা বাড়ানোর জন্য ওই দিন যুদ্ধযাত্রা শুরু করলেন। শুরু হয়ে গেল এই দিনটাতে যুদ্ধযাত্রার নতুন পরম্পরা। ওই দিনটা পালিত হতে লাগল 'সীমোল্লঙ্ঘন দিবস' হিসাবে। নিজের সীমা অতিক্রম করে অভিযান করা। উদ্দেশ্য রাজ্য বাড়ানো।

এখন, রাজা যখন যুদ্ধে যাবেন, একা তো যাবেন না। তাঁর সঙ্গে সৈন্য দল যাবে। এই সৈন্য তো প্রজাদের মধ্য থেকেই আসে। তারাও যুদ্ধে যাবে। আর সবাই জানে যুদ্ধে গেলে বাঁচা-মরার নিশ্চয়তা নেই। যুদ্ধে সে আহত বা নিহতও হতে পারে। এক বিপদসংকুল অনিশ্চিত যাত্রা। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা হবে কিনা? তার নিজের এবং আত্মীয় পরিজনের, বন্ধুবান্ধবের। স্ত্রী-পুত্র কন্যার। তাই সে যুদ্ধে যাবার আগে সকলের কাছে বিদায় নিতে যায়। বড়দের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে যায়।

বড়রা গুরুজনরা আশীর্বাদ করেন এবং মিষ্টি খাওয়ান। কে জানে আর কোনদিন তাকে খাওয়ানোর সুযোগ হবে কিনা! ছোটরাও তাকে প্রণাম করে ও আশীর্বাদ নেয় । আর সে তার বন্ধুবান্ধব সমবয়স্কদের আলিঙ্গন কোলাকুলি করে বিদায় গ্রহণ করে। তারাও তাকে বিদায় শুভেচ্ছা জানায়। আর ঐ যে সৈন্যটি, তার স্ত্রী তো হবে সব থেকে বেশি উৎকণ্ঠিতা। কে জানে তার স্বামী ফিরবে কিনা? যদি না ফেরে তাহলে সে হবে বিধবা। এরকম অনেক স্ত্রী । তাই তারা যায় মা দুর্গার কাছে, ওই দিনই। সিঁদুর ঢালে মা দুর্গার পায়ে। তারপর সেই সিঁদুর পরিয়ে দেয় পরস্পরের সিঁথিতে। আশা-- মা দুর্গার চরণছোঁয়া সিঁদুর, এ তো পবিত্র, এর তো অনেক শক্তি। এই সিঁদুর আমার সিঁথিতে পরালে কারো শক্তি নেই এই সিঁদুর মোছে। এ সিঁদুর হবে অক্ষয়। সুতরাং আমার স্বামী যুদ্ধে নিরাপদ থাকবে। সেই আশায় সিঁদুর পরানো। তাই এই সিঁদুর খেলা। একটু পরেই স্বামী বেরোবে সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে। সুতরাং এই সিঁদুর খেলা এবং বিজয়ার প্রণাম, কোলাকুলি, মিষ্টি খাওয়া-এর কোনোটাই আনন্দের উৎসব নয়। মা দুর্গাকে বিদায় করে বা বিসর্জন দিয়ে আনন্দ করা যায় না। এসব হচ্ছে যুদ্ধ যাত্রার ঠিক পূর্বের কার্যকলাপ, নিরাপত্তা কামনায় এবং বিজয় কামনায়। অর্থাৎ সিঁদুর খেলা ও বিজয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আমাদের পূর্বপুরুষদের যুদ্ধ যাত্রার ইতিহাস। আজ বাঙালি ওই কার্যকলাপ গুলোকে অনুষ্ঠানরূপে ধরে রেখেছে। ভুলে গিয়েছে এর ইতিহাস ও তাৎপর্যকে এবং হয়ে গিয়েছে এক যুদ্ধবিমুখ জাত। আর পুরুষানুক্রমে এই যুদ্ধবিমুখতা বাঙালিকে পরিণত করেছে এক ভীরু কাপুরুষ পলায়নপর জাতে, যে জাত লড়তে জানেনা, পালাতে জানে। তাই বাংলা ভাগ হয়, বাঙালি রিফিউজি হয়।

এখন বিজয়াদশমী হয়ে গেছে 'শুভদিন'। কিসের? গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি কাজের জন্য। বাঙালি যদি বিজয়ার কোলাকুলির আসল ইতিহাসটা জানতো, তাহলে হয়ত এমন যুদ্ধ ভীরু জাতে পরিণত হত না। কিংবা হয়ত আসল ইতিহাসটা জানলে 'ওরে বাবা দরকার নেই' বলে প্রথাটাই বাদ দিয়ে দিত।

এখন এই ইতিহাসের অন্য একটা দিকে তাকানো যাক। এই বাংলায় তো ক্ষত্রিয় ছিল না। ইতিহাসে যতদূর চোখ যায়, দেখা যায় এই বাংলায় জাত ছিল, বর্ণ বা বর্ণপ্রথা ছিল না। খুব সম্ভব বর্ণাশ্রমও ছিল না। সেইজন্যই নাকি পান্ডবরা সারা ভারত চষে

বেড়ালেও বাংলায় ঢোকেনি। তাই এই বাংলাকে বলা হত পান্ডববর্জিত রাজ্য। কিন্তু ক্ষত্রিয় না থাকলেও ওই প্রথা ও পরম্পরাগুলি তো এই বাংলাতেও আমরা প্রবলভাবে দেখতে পাই। অর্থাৎ উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয়দের মত বাঙালিও যুদ্ধে যেত। এর থেকে দুটো সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসছে। এক, বাঙালি বা এই বাংলার অধিবাসীরা যুদ্ধ করত। দুই, বাংলা ও বাকী ভারতের ইতিহাস ও পরম্পরা একই। অতি প্রগতিশীল বামপন্থী ইতিহাসকার ও বুদ্ধিজীবিরা বাংলা ও বাঙালির উৎসবকে বাকী ভারতের থেকে আলাদা করে দেখাতে চান। তা ভুল। দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, প্রথা ও পরম্পরা বাকী ভারতের মতই ধর্মনির্ভর, পুরাণ ও রামায়ণ যার উৎস। সুতরাং বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রাচীন ভারতীয় জনগোষ্ঠীর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কোনভাবে পৃথক নয়।

এই ভাবে ভারতের যে কোন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ঠিকভাবে দেখলে একই জিনিস আমরা দেখতে পাবো যে বিশাল ভারতের সকল জনগোষ্ঠী একই সূত্রে আবদ্ধ। এটাই আমাদের জাতীয় সংহতি। আর এর ভিত্তি ধর্ম, আমাদের হিন্দু ধর্ম। এই সত্যকে যারা অস্বীকার করতে চায়, তাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত অথবা তারা কোন বিদেশী শক্তির এজেন্টের কাজ করছে। তারা এই ঐক্যকে ভাঙতে চায়, সুতরাং তারাই বিচ্ছিন্নতাবাদী। কাশ্মীরে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের থেকে এরা কোনো অংশে কম ক্ষতিকর নয়। এরা জাতীয় ঐক্য ভাঙতে চায়, এরা দেশ ভাঙতে চায়। এদের থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। এদের জন্যই ভারত ভেঙে পাকিস্তান হয়েছে। এদের জন্যই কাশ্মীর, নাগা, মিজো ও খালিস্থানী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রশ্রয় পেয়েছে। এরা জাতীয় সংহতি ভঙ্গকারী, এরা দেশদ্রোহী।

বাঙালির দুর্গাপূজা, বিজয়া ও সিদূঁরখেলার পিছনে যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে, তাকে সকলের কাছে তুলে ধরে বাঙালির শৌর্য বীর্যের পরম্পরাকে ফিরিয়ে আনা আজ এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন।

(স্বদেশ সংহতি সংবাদ-এর পুরাতন সংখ্যা থেকে পুনঃমুদ্রণ)

হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চাই

বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয় কেবল মুসলমানের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন। কেননা প্রতি পদক্ষেপে তিনি মুসলমান সেজে মুসলমানদের জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছেন। তবে সত্যিই যদি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোনও মুসলমান হতেন তাহলে হিন্দুরা বরং একটু সম্মান পেতেন। বাংলাদেশের হিন্দুরা প্রতিদিন প্রাণ হাতে নিয়ে ও মানসম্মান ইজ্জত খুইয়ে সাতপুরুষের ভিটে বিক্রি করে এখনও এদেশে চলে আসছেন। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গেই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে মানুষ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস শুরু করেছে নিরাপত্তার খাতিরে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-১ নং ও জয়নগর-২ নং ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের 'বার্থ রেজিস্টার' অনুসরণ করে দেখা যাচ্ছে যে দম্পতি পিছু হিন্দু সন্তান গড়ে ১.৩৭ জন, সেখানে মুসলমান সন্তান গড়ে ৫.৭১ জন। পশ্চিমবাংলার বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতা (সরকার ও বিরোধীপক্ষ) পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে। তাঁরা কি করে ধর্মান্ধ হয়ে মুসলিম তোষণ করছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। এতবড় আত্মঘাতী, নির্লজ্জ গোষ্ঠী আর পৃথিবীতে নেই। ইমাম, মাওলানা ও মৌলবীদের নেতৃত্বে সংখ্যা বাড়িয়ে দেশ দখলের যে ভয়ংকর চক্রান্ত চলছে সেটা আমাদের রাজনৈতিক নেতারা আর কবে বুঝবেন? মোয়াজ্জেনরা রাত সাড়ে তিনটের সময় তীব্র শব্দে মাইকের মাধ্যমে আজান দিয়ে যে শব্দদূষণ করছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের মাসে মাসে ভাতা দিচ্ছেন। কেননা তারা মুসলমান। আর এই আসন্ন দুর্গাপুজোয় কলকাতা হাইকোর্ট ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কত ফতোয়া দেবে। কিন্তু আজানের বিষয়ে কোন ফতোয়া নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একান্ত অনুরোধ তিনি যেন অতি শীঘ্র হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চালু করেন। কেননা এখন খুব টাকার দরকার।

বর্তমানে দেশেবিদেশে সন্ত্রাস এবং দেশদ্রোহিতার সঙ্গে কারা যুক্ত তা তো আর কারো বুঝতে বাকি নেই। যে কোন প্রকারে ভারতে হিন্দু নিধন করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করা—এরই তো নাম জেহাদ। আর এই জেহাদকে এগিয়ে যাওয়ার পথে সহযোগিতা করছেন আর একজন বাঙালি। গ্রাম পুড়লে দেবালয় বাঁচে না—শুধু বাঙালি কেন ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠের এই জ্ঞান আগেও ছিল না, এখনও নেই। আর এই জ্ঞান যখন হবে তখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। যেমন পাকিস্তান হয়েছে। পৃথিবীর কোন মুসলমান দেশে বিধর্মীদের কোনও স্থান নেই। অথচ আমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের বংশধরদের অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি। হিন্দুদের মতো এত বড় আত্মঘাতী জাতি আর পৃথিবীতে দেখা যায় না।

—শুকতারা সরকার, জয়নগর, দঃ ২৪ পরগণা

[সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ২২ সেপ্টেম্বর]

সংযোজন ঃ শুকতারা দেবীকে সমাজসচেতন মূলক এই চিঠি লেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিটি অবিকৃত অবস্থায় আমরা প্রকাশ করলাম।

হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে প্রথম আহ্বান

বন্ধু,

স্বামী বিবেকানন্দকে নকল করে বলি, যে অন্ধ সে দেখিতে পাইতেছে না আর একবার দেশবিভাগের অশনি সংকেত। যে বধির সে শুনিতে পাইতেছে না পুনঃ দেশ বিভাগের পদধ্বনি। আর এবার দেশ বিভাগ হবে ভারতের পূর্ব অংশে, অর্থাৎ বাংলা আর আসামকে নিয়ে। ১৯০৫ সালের ব্যর্থ স্বপ্ন আর ১৯৪৭-এর ভগ্ন স্বপ্নকে ওরা পুরো করবে। সাকার করবে। ওরা বলে, ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে ইংরেজরা ওদের হাত থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজত্ব কেড়ে নিয়েছিল। তাই ১৯৪৭ সালে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ইংরেজদের 'ফরজ' ছিল ঐ পুরো এলাকাটা ওদের দিয়ে যাওয়া। তা না করে ইংরেজরা ওদেরকে বঞ্চিত করে শুধু অর্ধেকটা বাংলা দিয়ে গিয়েছে। ওদেরকে ঠকিয়েছে। তাই পুরো বাংলা বিহার উড়িষ্যা ওদের হক্। সেই হক্ ওরা আদায় করবে। পুরো আদায় করবে। তার প্রথম পদক্ষেপ ১৯৪৭ সাল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ পঃ বঙ্গ আর আসাম।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর মানুষরা সেই পদক্ষেপের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। শুধু সীমান্তবর্তী জেলা নয়, বীরভূম, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার মানুষরাও সেই পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। আর কলকাতার মানুষরা তো এই ২১শে নভেম্বর (২০০৭) তসলিমা বিরোধী তাণ্ডবে পার্ক সার্কাসে তার ট্রেলার দেখে নিলেন। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চিত্রটি অল্পদিনের মধ্যেই দেখতে পাবেন।

বন্ধু, আমার একটা কথা হয়তো আপনাদের কাছে অবাক লাগতে পারে। ধানতলা, বানতলা, বাসন্তী, সোনাখালি, হেমতাবাদের ঘটনা পরিকল্পিত ভাবে ঘটানো হয়নি, বরং অসাবধানতাবশতঃ পরিকল্পনা বহির্ভূত ভাবে হয়ে গিয়েছে। ওদের পরিকল্পনা অনেক অনেক ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। সেই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য নিঃশব্দে চলেছে সংখ্যাবৃদ্ধির ফ্যাক্টরি। শুধু এপারে নয়, সীমান্তের ওপারেও। ওপারে প্রোডাকশন্ হয়ে সাপ্লাই হচ্ছে এপারে। জনসংখ্যায় ওদের পারসেন্টেজের কাঁটা চড় চড় করে বাড়ছে। বাংলা আসামে ১০টি জেলায় আমরা সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছি। আর ব্লক ধরলে তো ৬৪টি ব্লকে। সেখানে আমরা ওদের দয়ায় বেঁচে আছি। অনেক জায়গায় শঙ্খধ্বনি-উলুধ্বনি বন্ধ, দোল-দুর্গাপূজা বন্ধ, স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ। আর আমাদের মা-বোনেরা সেখানে প্রতি মুহূর্তে শঙ্কিত, কখন কি ঘটে যাবে, সেই আশঙ্কায় নয়, যা এখনই ঘটছে তা দেখে।

এই সমস্ত ঘটনাকে দিনের আলোয় আসতে দেওয়া হচ্ছে না। মানুষের বেদনা, কষ্ট, লাঞ্ছনা, আর্তনাদকে ধর্মনিরপেক্ষতার কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে চাপা দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সাচার কমিটি দিয়ে আমাদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে, যেন আমরাই অত্যাচারী, শোষণকারী।

নির্লজ্জ এই তোষণনীতির এই বিষবৃক্ষের পরিণাম কী? ১৯৪৭ সালে কি এই বিষবৃক্ষের ফল আমরা ভোগ করিনি? ডঃ বি.আর.আম্বেদকর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ অবধি গান্ধীজির তোষণনীতির ভয়ঙ্কর পরিণাম। সেই পরিণাম দেশের মাটি যাওয়া, পূর্ব-পুরুষের ভিটে যাওয়া, মা-বোনের ইজ্জত যাওয়া, কোটি কোটি মানুষের রিফিউজি হওয়া। এসব দেখেও আমাদের দলগুলো ও যে নেতারা সেই বিষবৃক্ষেই জলসেচন করছেন, তাঁরা অনেকেই নিজেরাই রিফিউজি। আর আমরা সাধারণ মানুষ সব দেখেও উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থেকে ভাবছি যে এভাবেই বোধহয় ঝড় থেকে বাঁচাতে পারব। ভুল। এভাবে বাঁচা যায় না। ৪৭ সালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা পারেননি। ১৯৯০ সালে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরাও পারেননি, যারা মোতিলাল-জহরলালের বংশধর।

এর বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। এই তোষণ নীতির বিরুদ্ধে, এই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে, এই কাপুরুষতার বিরুদ্ধে। এর বিরুদ্ধেই আমরা সংকল্প নেব দেশের মাটির রক্ষার জন্য, মা-বোনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য, হিন্দু সুরক্ষা ও হিন্দু স্বাভিমান রক্ষার জন্য। লড়াই জিতি না জিতি, কাপুরুষের মত পালাব না। লড়াই না করে হারব না। এই সংকল্প নিয়েই হিন্দু সংহতি-র প্রতিষ্ঠা হয়েছে ২০০৮ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী, কলকাতার ভারত সভা হলে।

এই সংকল্পকে সাকার করতে সকল হিন্দুকে, হিন্দু সংহতি মঞ্চে একত্র হতে আহ্বান জানাই।

তপন কুমার ঘোষ
সভাপতি

রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের দেশ ঘোর তমোগুণে নিমজ্জিত

সারা পৃথিবী ঘুরে এসে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের তুলনায় এদেশের লোকেরা অনেক বেশী তমোগুণাচ্ছন্ন—তমোগুণের মধ্যে একেবারে যেন ডুবে রয়েছে। বাইরে সাত্ত্বিকতার একটা ভেক, একটা ছদ্মবেশ, কিন্তু ভেতরটা ইটপাথরের মত নিষ্ক্রিয়। এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা কি দুনিয়ার কোন কাজ হতে পারে?

এ রকম একটা নিষ্ক্রিয় অলস ইন্দ্রিয়াসক্ত জাত পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেই বা কি করে? আগে পাশ্চাত্য দেশগুলো ঘুরে এসো, তার পর আমার এই কথার প্রতিবাদ করো। দেখতে পাবে পাশ্চাত্য জাতিদের জীবনে কত উৎসাহ উদ্যম, রজোগুণের কি অদ্ভুত বিকাশ। আর এখানে? এখানে মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমাট হয়ে রয়েছে, শিরা-উপশিরায় বয়ে যাবার ক্ষমতা নেই—যেন পক্ষাঘাতে সারা দেহ পঙ্গু ও অসাড় হয়ে গিয়েছে।

প্রয়োজন—রজোগুণপ্রবাহে তমোগুণ প্রবাহ প্রতিহত করা

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রবাহে প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তিসঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে, এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন।

সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়। সে বিশাল হৃদয় কোথায় যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। —আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?

এ পেষণেরই বা কি ফল?

শিশুকে ত্যাগের মহিমা বোঝানা সম্ভব নয়। শিশু নানা আশাভরসা নিয়েই জন্মেছে; ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধিই তার জীবনের সবখানি, ইন্দ্রিয় সুখের উপভোগই তার সমগ্র জীবন। সব সমাজেই এরূপ শিশুভাবাপন্ন লোক রয়েছে, যাদের পক্ষে কিছুটা ইন্দ্রিয়সুখের উপভোগ খুবই প্রয়োজনীয়। এই উপভোগের ভেতর দিয়েই তারা ইন্দ্রিয়সুখের অসারতা বুঝতে পারবে, আর কেবল তখনই তাদের মনে ত্যাগের ভাব আসবে। আমাদের শাস্ত্রে তাদের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালে এরূপ এক মনোভাব ও প্রথা দেখা দিয়েছিল যে সন্ন্যাসীর জন্য যে নিয়ম সবার বেলাতেই খাটাতে হবে। এটা ছিল প্রকাণ্ড ভুল। এই ভুল না ঘটলে ভারতে যে পরিমাণ দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দশা দেখা যাচ্ছে তা হতে পারত না।

তমঃপ্রভাবে আমাদের অধঃপতন

দেখিতেছ না, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড় বুদ্ধি পরবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে—যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে—যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই, কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ—বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন, বা ভবিষ্যতে হইবার আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

বুনো রামনাথের গল্প

নদীয়াতে তখন রাজত্ব করছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর নামেই কৃষ্ণনগর শহরটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্ব খুব বড়সড় ছিল না। কিন্তু নামডাক খুব ছিল। সকলে শ্রদ্ধার চোখে ওই রাজত্বকে দেখত। কারণ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের যেমন নবরত্ন সভা ছিল, তেমনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়ও নাম করা জ্ঞানীগুণীরা বিরাজ করতেন। মহারাজ জ্ঞানী ও গুণীদের কদর বুঝতেন, সম্মান দিতেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী। তাই তাঁর রাজসভার গুণের ছটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়া তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল। প্রজাদের সঙ্গে তিনি স্নেহশীল পিতার মতই আচরণ করতেন। তাঁর রাজসভাতেই ছিলেন বিখ্যাত রসিক গোপাল ভাঁড়— যাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা আজও বাঙালি স্মরণ করে।

এহেন মহারাজার প্রধানা মহিষী অর্থাৎ মহারাণী একদিন রাগ করে গোঁসাঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। অন্নজল ত্যাগ করেছেন। রাজবাড়ীতে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। দাস দাসী, আত্মীয় স্বজন কেউ গিয়ে রাণীমার রাগ ভাঙাতে পারছে না। রাজার কাছে খবর গেল। মহারাজাও রাণীকে খুব ভালবাসতেন। তিনি ছুটে এলেন প্রাসাদের অন্দরমহলে। রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? রাণীর কিসের অভাব? তাঁর রাগ বা অভিমানের কারণ কী? অনেক সাধ্য সাধনার পর জানা গেল, রাণীমার অপমান হয়েছে। মহারাণী হয়েও যদি অপমান সহ্য করতে হয়, তাহলে এ সোনাদানা হীরে জহরতের মূল্য কি? তাই তিনি গোঁসাঘরে ঢুকেছেন। তাঁর অপমানের প্রতিকার চাই। একথা শুনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও বিচলিত হলেন। এক তো তিনি রাণীকে খুব ভালবাসতেন। তার উপর মহারাণীর অপমান মানে তো রাজারই অপমান। তাই তিনি ব্যাকুল হয়ে রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোথায় কিভাবে রাণীর অপমান হল? কে রাণীকে অপমান করল? তখন রাণীর দাস দাসীদের কাছ থেকে ঘটনা জানা গেল। রাণী গিয়েছিলেন গঙ্গাস্নান করতে। রাণী তো আর একা যান না। লোক লস্কর সান্ত্রী সেপাই দাস দাসী সহকারে রাণী স্নান করতে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলেন। মেয়েদের স্নানের ঘাট আলাদা। সুতরাং ঘাটে মোটামুটি ভিড় ছিল।

রাণীমা সদলবলে ঘাটে পৌঁছুতেই পালকি বেহারাদের হুম্ হাম আওয়াজ আর দাস দাসীদের কলকোলাহলে সকলের নজরে পড়ল যে রাণীমা এসেছেন গঙ্গাস্নানে। স্নানরতা মহিলারা অনেক তাড়াতাড়ি স্নান নিয়ে উঠে গেল। যাদের তখনও স্নান হয়নি, তারা ঘাটের দুপাশে সরে গিয়ে রাণীমা ও তাঁর দলবলকে স্নানের জন্য জায়গা করে দিল। রাণীমা সদলবলে সেই বাঁধানো ঘাটে স্নান করতে নামলেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন যে অন্য সব মহিলারা ঘাট ছেড়ে দিলেও একটা বৌ ঘাট ছাড়েনি। রাণীর দিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই বৌটা নিজের মনে স্নান করে চলেছে। রাণীর ভিতরে ভিতরে একটু রাগ হল। কিন্তু তবু তিনি কিছু বললেন না। হয়ত অল্প কারণে হম্বিতম্বি করা তখনকার রীতি ছিল না। তিনি আড়চোখে ঐ বৌটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, বৌ-টা একেবারেই নিরাভরণ। গায়ে কোন গয়না নেই। এমনকি হাতে শাঁখাও নেই। শুধু সধবার চিহ্নস্বরূপ বাঁহাতে লাল সুতো বাঁধা আছে। রাণীমা সখী পরিবৃত হয়ে স্নান করছেন। ওদিকে ঐ বৌ-টির স্নান হয়ে গেছে। তখনও এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে হাতে করে গামছা ধুচ্ছে। আর তাতেই বিপত্তি। সেই গামছার জলের ছিটে এসে লাগল রাণীর গায়ে। রাণী আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। আগে থেকেই ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিলেন। এবার গায়ে জলের ছিটে লাগাতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। চিৎকার করে দাসীদেরকে বললেন, 'দ্যাখ তো মেয়েটা কে? মাগীর হাতে লালসুতো ছাড়া একগাছা শাঁখা জোটে না, তার এত দেমাক কিসের যে রাণীর গায়ে জল দেয়?' যেন গোখরো সাপের লেজে পা পড়েছে এইভাবে রাণীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সেই নিরাভরণ মহিলাটি। এবং ততোধিক তেজের সঙ্গে বলল— 'এই মাগীর হাতে এই লালসুতো আছে তাই নবদ্বীপের সম্মান আছে। তুমি রাণী বলে অত দেমাক দেখিও না। আমার হাতে এই লালসুতো যখন থাকবে না, তখন নবদ্বীপের এই সম্মানও থাকবে না।' এই কথা বলে বৌটা সদর্পে ঘাট থেকে স্নান সেরে উঠে গেল। ঘাট ভর্তি মহিলারা ঐ বৌটির কথাগুলো শুনল। তা দেখে রাণীমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তিনি মাথা নিচু করে ঘাট ছেড়ে উঠে এসে পালকিতে বসলেন। রাজপ্রাসাদে ফিরে সোজা গোঁসাঘরে। খাওয়াদাওয়া বন্ধ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই ঘটনা শুনে অবাকও হলেন, ক্রুদ্ধও হলেন। কে এই দেমাকী দরিদ্র মহিলা যার মহারাণীকেও অপমান করতে বাধে না! তিনি রাণীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ঐ মহিলাকে খুঁজে বের করা হবে, রাণীর অপমানের প্রতিকার করা হবে। তাঁর কথায় আশ্বস্ত হয়ে রাণীর রাগ ভাঙল। অন্নজল গ্রহণ করলেন।

রাজা চারিদিকে চর পাঠালেন ঐ মহিলাকে খুঁজে বের করতে এবং তার সম্বন্ধে সংবাদ আনতে। খবর আসতে বেশী দেরী

লাগল না। খবর যা পেলেন তাতে রাজার মাথায় হাত। রাণীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁর অপমানের প্রতিকার করবেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রাখার তাঁর ক্ষমতা বা উপায় নেই। কারণ ঐ নিরাভরণ দরিদ্র মহিলাটি আর কেউ নন, পণ্ডিত বুনো রামনাথের পত্নী। মহারাজা জানেন, সেদিন ভরা ঘাটের মাঝে ঐ মহিলাটি যা বলেছেন—তা সত্যি। সত্যি তাঁর হাতের লালসুতো, অর্থাৎ তাঁর স্বামী বুনো রামনাথের জন্যই নবদ্বীপের সম্মান আছে।

সেইসময় সমগ্র উত্তর ভারতে জ্ঞানচর্চার দুটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কাশী বা বারাণসী ও নবদ্বীপ। এই দুই স্থানের পণ্ডিতদের মধ্যে জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চার প্রতিযোগিতা লেগেই থাকত। দুই স্থানের পণ্ডিতরাই নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে কাশী থেকে এলেন এক মহাপণ্ডিত। তিনি দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছেন। পথে সমস্ত স্থানে সকল পণ্ডিতকে তিনি শাস্ত্র তর্কে পরাভূত করেছেন। পৌঁছেছেন নবদ্বীপ। নবদ্বীপের খুব নামডাক। তাই তিনি নবদ্বীপে এসে সেখানকার সব পণ্ডিতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা ও শাস্ত্রীয় বিতর্কের জন্য। তখনকার দিনে সারা ভারতে সংস্কৃত ভাষাতেই শাস্ত্রচর্চা হত। তাঁর আহ্বান শুনে নবদ্বীপের অনেক বড় বড় পণ্ডিত এগিয়ে এসেছেন। এবং সকলেই ঐ কাশীর পণ্ডিতের কাছে বিতর্কে পরাজিত হয়েছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সভাপণ্ডিতও পরাজিত হয়েছেন। নবদ্বীপের মাথা নীচু হয়ে গিয়েছে। কাশীর কাছে নবদ্বীপ পরাজিত। নবদ্বীপের সম্মান ভুলুণ্ঠিত। রাজসভায় সকলে বিমর্ষ। রাজা মন্ত্রীর কাছে পরামর্শ চাইলেন—আর কি কোন উপায় নেই নবদ্বীপের সম্মান বাঁচানোর? ওদিকে কাশীর পণ্ডিত তাল ঠুকে চলেছেন—আ যাও, কৌন্ হ্যায়! মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, শেষ উপায় একটা আছে। কিন্তু সে বড় কঠিন কাজ।' রাজা উৎসুক— কি উপায় মন্ত্রীমশাই? আছেন আর কোনো পণ্ডিত আমার রাজ্যে যিনি এই পণ্ডিতকে তর্কে হারাতে পারবেন?' মন্ত্রী বললেন, 'আছেন মহারাজ'। রাজা— 'কি তাঁর নাম? কোথায় থাকেন তিনি? আমি তাঁকে চিনি না কেন?' মন্ত্রী— 'মহারাজ, তাঁর নাম বুনো রামনাথ। নবদ্বীপ রাজ্যের শেষ প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যে কুটীর বেঁধে থাকেন তিনি। বিরাট বিদ্বান। জঙ্গলে থাকেন বলে লোকে তাঁকে বলে বুনো রামনাথ। তিনি কখনও নগরে আসেন না। তাই আপনি তাঁকে চেনেন না।' রাজা—তাহলে আপনি তাঁকে রাজধানীতে আনার ব্যবস্থা করুন। যেভাবে হোক নিয়ে আসুন। নবদ্বীপের সম্মান রাখতেই হবে।' রাজার আদেশে মন্ত্রী নিজে গেলেন পণ্ডিত রামনাথের কুটিরে। বনের মধ্যে প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় তপোবনের মত পরিবেশ। প্রশস্ত কুটির। রামনাথের পরিবার ছাড়াও ৩০-৪০ জন পড়ুয়া ছাত্র নিয়ে টোল। সেখানে অখণ্ড জ্ঞানের চর্চা চলছে। চলছে গুরু শিষ্য পরম্পরায় শাস্ত্র শিক্ষা। সে শাস্ত্র শুধু ধর্মশাস্ত্র নয়। তার মধ্যে থাকত ব্যাকরণ, দর্শন, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি ভৌতিক বিদ্যাও। প্রাচীন ভারতকে দেখার সৌভাগ্য যাদের হয়নি, তারা বিশ্বাস করবে না ভৌতিক শাস্ত্র ও জড় বিজ্ঞানের চর্চাতেও আমাদের মুনি-ঋষিদের কতটা দখল ছিল। যারা বুনো রামনাথের মত জ্ঞানতপস্বীদের দেখেছিলেন, তাঁদের বিশ্বাস হত। এই প্রবন্ধের লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল এ যুগের বিংশ শতাব্দীর বুনো রামনাথকে দেখার। তাই এই লেখকের বিশ্বাস আছে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্বে ও মহত্বে। এই লেখক যে বুনো রামনাথকে দেখেছে, তিনি ছিলেন হাওড়া শিবপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রায়শঃ কাছার কাপড় খুলে যাওয়া, ধুতি পড়া, জামায় নস্যির দাগ লেগে থাকা হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ। দর্শন, সংস্কৃত, সাহিত্য, ক্যালকুলাস, রসায়নে যাঁর ছিল অবাধ গতি, আর বাড়িতে এক তরকারি ভাত। সেই শিশুর মত সরল নিরাড়ম্বর জ্ঞানতপস্বীকে আমি দেখেছি। তাই তো ছোটবেলায় দাদুর মুখে বুনো রামনাথের গল্প শুনে বড় বয়সে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছি।

ফিরে আসা যাক গল্পে। মন্ত্রী গিয়ে রামনাথকে বিনম্র অনুরোধ জানালেন, রাজসভায় এসে কাশীর পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হতে। রামনাথ অরাজী। মন্ত্রী বললেন—রাজ্যের প্রজা হিসাবে রাজ্যের সম্মান বাঁচানোরও একটা দায়িত্ব পণ্ডিতের আছে। তাই তিনি যেন রাজার বিশেষ অনুরোধ রাখেন। তখন রামনাথ রাজী হলেন। কিন্তু দুটি শর্ত দিলেন তিনি। সেই শর্ত মানলে তবেই তিনি রাজধানীতে যাবেন ও শাস্ত্রীয় বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন। নবদ্বীপের সম্মান রাখতে ও রাজার আদেশ পালন করতে মন্ত্রী যে কোন শর্তে রাজী। শর্ত দুটো কি? প্রথম-রামনাথ কোন পারিতোষিক গ্রহণ করবেন না; রাজা যেন তাঁকে কোন পারিতোষিক অর্থাৎ পুরস্কার দেওয়ার চেষ্টা না করেন। (শাস্ত্রে এরই নাম অস্তেয় বা অপরিগ্রহ—যা ধর্মের অন্যতম লক্ষণ)। দ্বিতীয় শর্ত—যতদিন তর্ক চলবে তিনি রাজপ্রাসাদে তো থাকবেনই না, এমনকি রাজধানী শহরেও থাকবেন না। কারণ, পণ্ডিত নগরবাসকে পাপের বা অপবিত্রতার কারণ বলে মনে করতেন। তাই নগরের বাইরে কোন গ্রামে তাঁর নিবাস ব্যবস্থা করতে হবে। নিরুপায় হয়ে দুটি শর্তই মেনে নিয়ে মন্ত্রী পণ্ডিত বুনো রামনাথকে নবদ্বীপে নিয়ে এলেন। তাঁর কথামত নবদ্বীপের পাশে গ্রামে কোন একটি বাড়িতে

তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হল। রোজ সকালে স্নান-আহ্নিক-পুজো সেরে ভোজন করে রাজসভায় আসতেন এবং কাশীর সেই অহঙ্কারী পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিতর্ক করতেন। গোটা নবদ্বীপ এবং দূর দূর থেকে পণ্ডিত ও জ্ঞানপিপাসুরা, এমনকি কৌতূহলী সাধারণ মানুষও রাজসভায় ভিড় করতেন ঐ শাস্ত্রীয় বিতর্ক দেখার জন্য। মানুষদের মনে হত যেন কয়েকশ বছর আগে আদি শঙ্করাচার্য ও মন্ডন মিশ্রের বিতর্ক পুনরায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বিতর্কের আলোচনায় গোটা নবদ্বীপ গম্‌গম্‌ করছে। টানটান উত্তেজনা। কাশী বড় না নবদ্বীপ বড়?

টানা দশদিন ধরে বিতর্ক চলল। এঁর তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তর উনি দেন, তো ওনার জটিল প্রশ্নের উত্তর ইনি দিয়ে দেন। কে জেতে কে হারে? দশদিন বিতর্কের পর কাশীর পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। বুনো রামনাথের জ্ঞানের সামনে তাঁর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। নবদ্বীপের সম্মান বাঁচল। নবদ্বীপবাসীর মাথা আবার উঁচু হল। বুনো রামনাথের নামে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। কাশীর পণ্ডিত দিগ্বিজয় অভিযান ছেড়ে দিয়ে কাশী ফিরে গেলেন।

এত আনন্দেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিমর্ষ, মনমরা। পণ্ডিত রামনাথকে সম্মান জানানোর তাঁর কোন উপায় নেই। শর্তের বন্ধনে তিনি আবদ্ধ। রামনাথ ফিরে গেলেন তাঁর তপোবনে। কিন্তু রাজার মন ছটফট করছে। এতবড় পণ্ডিত তাঁর রাজ্যে আছে, অথচ তারজন্য তিনি কিছুই করতে পারছেন না। রাজা আবার পাঠালেন মন্ত্রীকে-যাও দেখে এস, যদি পরোক্ষভাবেও কোনপ্রকারে পণ্ডিতকে কিছু সাহায্য করা যায়। মন্ত্রীর উপর রাজার বড় ভরসা। মন্ত্রী আবার গেলেন। দেখলেন, যথারীতি কুটিরের সামনে বিশাল তেঁতুলগাছের নীচে ছায়ায় বসে রামনাথ ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। আর ব্রাহ্মণী বাড়ির ভিতরে মাটির গর্ত করা উনুনে বড় হাঁড়ি বসিয়ে চুলায় কাঠ ঠেলছেন। মন্ত্রী গিয়ে পণ্ডিতকে শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করলেন। তারপর নিবেদন করলেন যে মহারাজা তাঁকে পাঠিয়েছেন। তাঁর রাজ্যের মধ্যে এত নামকরা একটা টোল চলছে। এই টোল রাজ্যের গর্ব। তাই মহারাজ জানতে চেয়েছেন যে পণ্ডিতের কিছু অভাব আছে কিনা? শিশুর মত সরল রামনাথ এই প্রশ্নের অন্য অর্থ বুঝলেন। তিনি মন্ত্রীকে বললেন - কোন 'অভাব' তো আমি অনুভব করছি না। মীমাংসা, ন্যায়, ব্যাকরণ, দর্শন, সাহিত্য, বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি কোন শাস্ত্রজ্ঞানেরই 'অভাব' তিনি অনুভব করছেন না। মন্ত্রী বুঝলেন যে তাঁর প্রশ্নের অর্থ ঐ বিরাট পণ্ডিত বুঝতে পারেন নি। কারণ, তাঁর মনোজগত চিন্তাজগত বিদ্যা, জ্ঞান ও শাস্ত্র নিয়েই পরিপূর্ণ। তখন মন্ত্রী আরো খুলে বললেন যে এতগুলি ছাত্রদের ভরণপোষণের বিষয়ে কোন অভাব বা প্রয়োজনীয়তার কথা মহারাজ জানতে চেয়েছেন। পণ্ডিতের মাথায় ঢুকল। তখন তিনি বললেন- ওই অভাবের কথা তো আমি বলতে পারব না। ওটা ব্রাহ্মণী জানেন। তিনি বলতে পারবেন। আপনি বাড়ির ভিতরে গিয়ে ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করুন। মন্ত্রী ভিতরে গিয়ে ব্রাহ্মণীর চরণস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণী তখন কোমরে কাপড় বেঁধে উনুনে কাঠ ঠেলছেন। ৩০-৪০ জন ছাত্রের রান্না তাঁকে প্রতিদিনই করতে হয়। (আজকের আধুনিক মহিলারা হয়ত একথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু এটা সত্যি।) মন্ত্রীমশাই ব্রাহ্মণীকে বললেন— মা, এতজন ছাত্রের প্রতিদিন অন্নের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হয়। তাই মহারাজ জানতে চেয়েছেন, এখানে কোন অভাব আছে কিনা! মহারাজ প্রতিদিন এখানে সিধে পাঠাতে চান। সিধে মানে চাল ডাল নুন তেল কাঁচাসবজি ইত্যাদি। ব্রাহ্মণী যে একটু মুখরা ছিলেন সেকথা পাঠক আগেই জেনেছেন। মন্ত্রীর কথা শুনে ব্রাহ্মণী যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। খর্‌খর্‌ করে বলে উঠলেন- মন্ত্রী, তোমার রাজাকে বোলো যে তার ভীমরতি ধরেছে। তাই তোমার মত মন্ত্রী রেখেছে। তোমার রাজার এত দুঃসাহস যে পণ্ডিতের ঘরে অভাব আছে কিনা জানতে চেয়েছে? শোন, তোমার রাজাকে বলে দিও যে যতদিন আমার ঘরের সামনে এই তেঁতুলগাছ আছে, ততদিন কোন অভাব হবে না। আমার ছেলেরা (মানে ছাত্ররা) গ্রাম থেকে চাল নিয়ে আসে। এই তেঁতুলগাছ যতদিন আছে, ততদিন মোটা চালের ভাত আর তেঁতুলপাতার ঝোল-এর অভাব কোনদিন হবে না। তোমার রাজাকে বলে দিও- পণ্ডিতের ঘরের অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করার দুঃসাহস যেন আর কোনদিন না করেন।' মন্ত্রীর মুখ ছোট হয়ে গেল, গলা শুকিয়ে গেল। মাথা নীচু করে নবদ্বীপে ফিরে এলেন। রাজাকে সব কথা বললেন। রাজা অধোবদন হয়ে গেলেন। পণ্ডিত বুনো রামনাথকে অনুগৃহীত করার সকল চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেল।

তাই সেদিন নবদ্বীপের ঘাটে ব্রাহ্মণীর ঐ তেজ দর্শন করেছিলেন রাণী। এ তেজ, এ শক্তি ত্যাগের, তপস্যার ও অপরিগ্রহের। এরই নাম ধর্ম, যে ধর্ম শাস্ত্রের পৃষ্ঠা থেকে জীবনের প্রতিফলিত হয়েছে। একেই শিবপ্রসাদ রায় বলতেন ফলিত ধর্ম বা অ্যাপ্লায়েড ধর্ম।

(স্বদেশ সংহতি সংবাদ-এর পুরাতন সংখ্যা থেকে পুনঃমুদ্রণ)

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট-এর গ্রন্থ **'দি স্টোরি অফ সিভিলাইজেশন'** *থেকে*

মুসলমানের ভারত বিজয়

(VI. THE MOSLEM CONQUEST)

উইল ডুরান্ট

[ভারতের দুর্বলতা—মহম্মদ গজনী—দিল্লীর সুলতানী বংশ—একপেশে সংস্কৃতি—পাশবিক নীতি—ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষা]

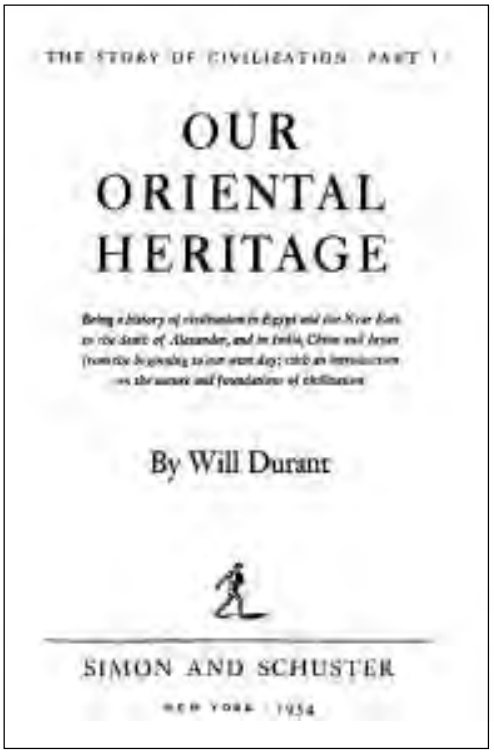

মুসলমানদের ভারত-বিজয় সম্ভবতঃ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রক্তাক্ত কাহিনী, যে কোন জাতির পক্ষে এক নৈরাশ্যজনক অধ্যায়। এ থেকে সুস্পষ্ট শিক্ষা পাওয়া যায় যে মানবসভ্যতা এমনই এক নিরাপত্তাহীন বস্তু যার সূক্ষ্ম জটিল বিন্যাস ও স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও শান্তি যে কোনও সময় বর্বর আক্রমণের দ্বারা তছনছ হয়ে যায়। হিন্দুরা তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভেদ এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধের দ্বারা নিজেদের শক্তিক্ষয় করে চলে। তারা জীবনবিমুখ বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মমতকে গ্রহণ করে নিজেদের বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রামের জীবনযাত্রাকে দুর্বল করে ফেলে। হিন্দুরা তাদের সীমান্ত রক্ষা, তাদের রাজধানী, ধনসম্পদ, তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে নিজেদের শক্তিকে সংহত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে শক, হুন, আফগান এবং তুর্কীরা ভারত-সীমান্তে বারে বারে হানা দিতে থাকে এবং তারা সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে—কবে এ জাতির দুর্বলতা তাদের পথ দেখিয়ে দেশের মধ্যে ঢুকতে দেবে। চার শত বছর (৬০০-১০০০ খৃষ্টাব্দ) ধরে ভারত দখলের জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে, অবশেষে তা-ই হোল।

মুসলমানদের প্রথম ক্ষণস্থায়ী হানাদারি আক্রমণ শুরু হয় পশ্চিম পাঞ্জাবের মূলতানে (৬৬৪ খৃঃ)। পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে হানাদারেরা তাদের সুযোগ-সুবিধা মত আক্রমণ চালিয়েই যেতে থাকে। এর পরিণতি হল মুসলমানেরা সিন্ধু উপত্যকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে লাগল। তাদের সমধর্মী আরবেরা ঐ সময়ে (৭৩২ খৃঃ) ইউরোপে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পশ্চিম দিকে তুর এলাকায় যুদ্ধ শুরু করে। তবে প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের ভারত বিজয় সম্পন্ন করতে খৃষ্টের জন্মের পরে এক হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়।

৯৯৭ সালে এক তুর্কী সর্দার মামুদ (বা মহম্মদ) পূর্ব আফগানিস্তানের এক ছোট্ট রাজ্য গজনীর সুলতান হন। মামুদ জানতেন তাঁর রাজ্য খুবই ছোট এবং দরিদ্র। কিন্তু নিকটেই রয়েছে এক সুপ্রাচীন দেশ ধনসম্পত্তিতে পূর্ণ ভারত। পরবর্তী সিদ্ধান্ত তো অতি সুস্পষ্ট। হিন্দু পৌত্তলিকতাকে ধ্বংস করার ধর্মীয় পবিত্র কর্তব্যপালনের নাম করে মামুদ ভারতের সীমান্তে সেনাবাহিনী নিয়ে আছড়ে পড়লেন। তার সঙ্গে ধর্মোন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনীর চোখে ভারতের বিপুল বৈভব লুণ্ঠনের স্বপ্ন। ভীমনগরে অপ্রস্তুত হিন্দুদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মামুদ। হিন্দুরা হল কচুকাটা, শহরগুলি হল লুণ্ঠিত, মন্দিরগুলি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হল। শত শতাব্দীর সঞ্চিত বিপুল ধনরাশি কেড়ে নিয়ে স্বদেশে পাড়ি দিলেন মামুদ। গজনীতে ফিরে দেশ-বিদেশের রাজদূতদের সামনে তুলে ধরলেন লুণ্ঠিত অগাধ রত্নসম্ভার—'মণি, চুনী, পান্নার দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে যেন মদের মধ্যে বরফের টুকরো, হীরের আকার

যেন এক একটি ডালিমের মতো।' এরপর প্রতি শীতেই মামুদ ঝাঁপিয়ে পড়েন ভারতের উপর—লুণ্ঠিত সোনা-দানায় সিন্দুক ভরে ওঠে। নিজের সেনাবাহিনীর সর্বশ্রেণীর জন্য অবাধে হত্যা ও লুণ্ঠনের অধিকার দেওয়া হয়। প্রতি বসন্তে ফিরে যান নিজের রাজধানীতে, গত বারের চেয়ে আরও বেশি ধনী হয়ে ওঠেন। মথুরায় (যমুনার তীরে) মামুদ মন্দির থেকে সোনার মূর্তি, যার অঙ্গে বহুমূল্য প্রস্তরাদি খচিত, সেটির সাথে মন্দিরের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার খালি করে সংগ্রহ করলেন অপরিমিত সোনা, রূপা, মণি-মাণিক্যাদি। মামুদ এখানকার মন্দিরের গঠনশৈলীর প্রশংসা করে উল্লেখ করেন যে অনুরূপ একটি মন্দির তৈরি করতে হলে দশ কোটি 'দিনার' লাগবে এবং সময় লাগবে দু'শো বছর। এর পরে তিনি হুকুম দিলেন 'ন্যাপথা' দিয়ে পুরা মন্দির ভিজিয়ে আগুন দিয়ে একেবারে ছাই করে দিতে।' ছয় বছর পরে মামুদ উত্তর ভারতের আর একটি ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির-নগরী সোমনাথ ধ্বংস করেন। এখানকার সমস্ত লোক—পঞ্চাশ হাজার জনকে হত্যা করেন এবং সমস্ত ধনসম্পদ গজনীতে নিয়ে যান। অবশেষে, ইতিহাস যত দূর রয়েছে, তাতে জানা যায় মামুদই ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ধনী। কখনও কখনও মামুদ নগরীগুলি ধ্বংস করে সেখানকার অধিবাসীদের হত্যা না করে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে তাদের বিক্রয় করে দিতেন। আবার এই সকল বন্দীদের সংখ্যা কয়েক বছর এত বৃদ্ধি পেল যে কোনও ক্রেতা পাওয়া যেত না যে মাত্র কয়েক শিলিং ব্যয় করে এক জন দাস কিনবে। প্রতিটি অভিযানের পূর্বে মামুদ হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতেন, আল্লা যেন তাঁর বাহুতে আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ সময় তিনি রাজত্ব করেছিলেন। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে, তদানীন্তন কালে মামুদ মহত্তম সম্রাট এবং যে কোনও কালের জন্য তিনি সকলের চেয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপী শাসক।

এক বিরাট চোরের এই সাফল্য তার মৃত্যুর পর সাধারণের চোখে তাকে মহানতা প্রদান করেছিল। তা দেখে অপরাপর মুসলিম শাসকেরা অনুপ্রাণিত হয়ে লাভবান হয়েছিল বটে, কিন্তু মামুদের চেয়ে অধিকতর সাফল্য আর কেহ অর্জন করেনি। ১১৮৬ সালে আফগানিস্তানের তুর্কী উপজাতির ঘুরি (বা ঘোরী) ভারত আক্রমণ করে দিল্লী দখল করে মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন। বাজেয়াপ্ত করেন তাদের সকল ধন-রত্ন। দিল্লীতে তাদের সুলতানী প্রতিষ্ঠা করতে স্থাপন করেন প্রাসাদ। শুরু হল বিদেশী স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা। সমগ্র উত্তর ভারত তিন শতক ধরে শাসিত থাকার অবসান হয় গুপ্তহত্যা এবং বিদ্রোহের মাধ্যমে। প্রথম রক্তস্নাত সুলতান কুতবুদ্দীন আইবক—নির্দয়, ধর্মোন্মাদ এবং নিষ্ঠুর বলে খ্যাত। মুসলিম ঐতিহাসিকদের রকথায়, 'কুতবুদ্দীনের দানে অনুগৃহীতদের সংখ্যা যেমন লক্ষাধিক, তেমনি হত্যার সংখ্যাও শত সহস্র।' এই যুদ্ধবাজ এক যুদ্ধে 'পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তিকে ক্রীতদাস করেন, নিজেও ছিলেন মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস এবং হিন্দুদের রক্তে যুদ্ধক্ষেত্রও হয়ে ওঠে

রক্তের বন্যায় কর্দমাক্ত।' অপর এক সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন বিদ্রোহীদের দমন করতেন হাতির পদদলনে দলিত করে অথবা তাদের ছাল ছাড়িয়ে খড় ভর্তি করে দিল্লী দরওয়াজায় ঝুলিয়ে দিয়ে। যখন দিল্লীতে বসবাসকারী কিছু মোগল ইসলাম গ্রহণ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী (চিতোর বিজেতা) সমস্ত পুরুষদের (সংখ্যা পনের থেকে ত্রিশ হাজার) এক দিনেই হত্যা করেন। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। পরে তিনি খ্যাতি লাভ করেন এক মহান বিদ্বান ও লেখক রূপে। গণিত-পদার্থবিদ্যা এবং গ্রীক দর্শনেও তার শখ ছিল। আবার রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতাতেও তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের অতিক্রম করেন। এই সুলতানেরই এক বিদ্রোহী ভাইপোকে কেটে তার রক্তমাংস ভাইপোর স্ত্রী ও পুত্রকে খেতে তিনি বাধ্য করেন। তাঁরই শাসনকালে মুদ্রাস্ফীতিতে দেশ এক ভয়াবহ বিপর্যয়ে পড়ে। প্রজারা যত দিন না বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়, ততদিন অবলীলায় তাদের হত্যা করে রাজ্য জুড়ে মৃতের পাহাড় ইনিই গড়ে তোলেন। তিনি এত হিন্দু কোতল করেন যে, মুসলিম ইতিহাসকারেরা লেখেন—'তাঁর রাজকীয় তাঁবু এবং বিচারালয়ের সামনে সর্বদা স্তূপীকৃত থাকত মৃতদেহ শবদেহ। জল্লাদ আর মুদ্দফরাসেরা মৃতদেহগুলি টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো। আম জনতার সামনে হত্যাকাণ্ড চলতো অবিরাম।' দৌলতাবাদে নূতন রাজধানী করে সমস্ত দিল্লীকে মরুভূমি করে সকলে দিল্লীবাসীকে সেখানে যেতে বাধ্য করা হয়। সুলতান যখন শুনলেন যে, একজন অন্ধ দিল্লীতে রয়ে গেছে, তখন হুকুম দিলেন, তাকে যেন টানতে টানতে নূতন রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়। আদেশ পালিত হলে দেখা গেল অন্ধের একটি পা

কেবল এসে পৌঁছেছে।' সুলতানের অভিযোগ ছিল, প্রজারা তাঁকে ভালবাসে না, অথবা তাঁর ন্যায়বিচারকে মান্যতা দেয় না। এই শাসক সিকি শতাব্দী রাজত্ব করেন এবং শয্যাগত হয়ে মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারী ফিরোজ শাহ বাংলা আক্রমণ করেন। তিনি প্রতিটি হিন্দুর মাথা কাটা পিছু পুরস্কার ঘোষণা করেন। তাতে ১,৮০,০০০ মাথা কাটা পড়ে। প্রতিটি হিন্দু গ্রাম থেকে ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হোত। তিনি ৮০ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন। সুলতান আহমেদ শাহ তাঁর রাজত্বে প্রতিরোধবিহীন হিন্দুদের হত্যা করতেন। সংখ্যা যেদিন বিশ হাজার অতিক্রম করত সেদিন থেকে তিনদিন ধরে তাঁর চলতো বিশেষ ভোজ পর্ব।

এই সকল শাসকেরা অধিকাংশই ছিলেন কুশল ও দক্ষ ব্যক্তি। তাঁদের অনুগামীরা ভয়ঙ্কর রকমের সাহসী ও অধ্যাবসায়ী। এই গুণগুলি ছিল বলেই আমরা বুঝতে পারি চারিদিকে এত সকল বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী ঘিরে থাকা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় শাসকশক্তি কী করে এত দিন টিঁকে ছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন এমন এক ধর্মের অস্ত্রে সজ্জিত যেটি কার্যক্ষেত্রে সামরিক ভাবাপন্ন। আবার, তৎকালীন ভারতের জনপ্রিয় ধর্মমতগুলির তুলনায় তাঁদের সুখ-দুঃখ নিস্পৃহ একেশ্বরবাদী ধর্মমত ছিল অনেক অনেকখানি এগিয়ে। তাঁরা স্বীয় ধর্মমতের আকর্ষণকে গোপন রাখতেন। হিন্দু ধর্মমতের প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে হিন্দুদের আরও বেশি করে আত্মানুসন্ধানের পথে ঠেলে দেন। এই বুভুক্ষু স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে যোগ্যতা ও নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল, তাঁরা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, কারিগর ও কলাবিদ যাঁরা অধিকাংশই হিন্দু বংশজ, তাদের নিয়োগ করতেন বড় বড় মসজিদ ও মকবরা নির্মাণের কাজে। শাসকদের মধ্যে পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনও ছিলেন, যাঁরা বিজ্ঞানী, কবি এবং ঐতিহাসিকদের সাথে আলোচনা করে তৃপ্ত হতেন। এশিয়ার অন্যতম প্রখ্যাত জ্ঞানী, পণ্ডিত আলবেরুনী গজনীর মামুদের সাথে ভারতে এসেছিলেন, যিনি ভারতের উপর এক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যার সাথে তুলনা করা চলে প্রিনির 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি' এবং হামবোল্টের 'কসমস'। মুসলিম ইতিহাসকারদের সংখ্যা প্রায় মুসলিম সেনাধ্যক্ষদের সমান, তবে তাঁরা যুদ্ধ বা রক্তের হোলি খেলায় নিজেদের জড়াতেন না।

সুলতানেরা রাজস্বের প্রতিটি টাকা বলপূর্বক আদায় করে ছাড়তেন আর সেই সঙ্গে চলতো সোজাসুজি ডাকাতি। তবে সুলতানেরা ভারতেই থাকতেন, তাঁদের অর্জিত লুণ্ঠন সম্পদ ভারতেই ব্যয় হতো অর্থাৎ পরোক্ষে তা ভারতের আর্থিক জীবনেরই অঙ্গীভূত থাকত। তথাপি শাসকদের শোষণ ও নিপীড়ন যত বেশি চলেছে ততই হিন্দুদের স্বাস্থ্য, মনোবল ও শৃঙ্খলা দুর্বলতর হতে থাকে। তাদের বেঁচে থাকার বাতাবরণ ক্ষীণতর, অপ্রতুল আহার্য, রাজনৈতিক অনৈক্য এবং নৈরাশ্যবাদী ধর্মমত হিন্দুদেরকে দুর্বলতর করতে থাকে।

সুলতানদের পদ্ধতিগুলো আলাউদ্দীন খিলজীর কার্যাবলী থেকে ভালভাবে বোঝা যায়। তিনি তাঁর পরামর্শদাতাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, ''হিন্দুদেরকে পিষে ফেলার ও সমস্ত সম্পত্তি ও সম্পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার নিয়মকানুন গুলিকে সুসংবদ্ধ রূপ দিতে, কারণ এই সম্পত্তি ও সম্পদই তাদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বীজ। তাই তাদের অবদমিত করার মতো নিয়ম কর।" জমির ফসল থেকে উদ্ভূত আয়ের অর্ধেক সরাসরি সরকার পাবে, দেশীয় শাসকেরা নিতেন এক-ষষ্ঠাংশ। এক মুসলিম ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'কোনও হিন্দু মাথা উঁচু করে (সদর্পে) চলতে পারে না এবং তাদের ঘরে কোথাও সোনা-রূপার চিহ্ন থাকে না...অথবা আনন্দ ও প্রাচুর্য দেখা যায় না। ...রাজস্ব আদায়ের জন্য করা প্রহার, বন্দী, শেকল পরানো, কারাগার—সব কিছুরই প্রয়োগ চলত।' যখন আলাউদ্দীনের একজন বিদ্বান পরামর্শদাতা এই কঠোর নিয়ম-নীতির প্রতিবাদ করেন তখন আলাউদ্দীন প্রত্যুত্তরে বলেন, 'ও জ্ঞানী ব্যক্তি, আপনি এত বিদ্বান, কিন্তু আপনার বাস্তব জ্ঞান নেই; আমি নিরক্ষর তবে যথেষ্ট বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী। আপনি নিশ্চিত জানুন যে হিন্দুরা দরিদ্র না হলে তারা কখনও অবনত এবং অনুগত থাকবে না। তাই আমি আদেশ দিয়েছি, তাদেরকে যতটা প্রয়োজন ততটা শস্য, দুধ এবং দই বছরে বছরে দিতে, কিন্তু তারা সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না।'

এটিই আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুপ্ত তথ্য। আভ্যন্তরীণ বিভেদের ফলে এরা দুর্বল হয়ে বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে এরা নতিস্বীকার করেছে, হামলাকারীদের (অবাধ লুটে) এরা দরিদ্র ও ক্ষীণ হয়েছে। সমস্ত প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে ফেলে দৈবশক্তির আশ্রয় নিয়েছে; অদ্ভূত যুক্তি দিয়েছে যে, দাসত্ব ও প্রভুত্ব—দুটোই অলীক ভ্রান্তিমাত্র; এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ব্যক্তি বা জাতির স্বাধীনতা এমনকিছু বড় ব্যাপার নয় যা রক্ষা করতে এই ক্ষণস্থায়ী মনুষ্যজীবনকে কাজে লাগাতে হবে। এক সমুন্নত সভ্যতার এই বিয়োগান্তক কাহিনীর তিক্ত শিক্ষা হল এই যে, চিরন্তন সতর্কতাই সভ্যতার মূল্য। একটা জাতি অবশ্যই শান্তিকে ভালবাসবে, কিন্তু তাকে সর্বদাই তার বারুদকে তাজা রাখতে হবে।—**(পৃঃ ৪৫৯-৪৬৩)**

পত্রিকা দপ্তর থেকে

তসলিমা কাণ্ডে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা তুলে নিলেন মমতা ব্যানার্জী

তসলিমা কাণ্ডে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে মামলা এতদিন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে চলছিল তা রাজ্য সরকার থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। গত ১২ই সেপ্টেম্বর সরকারি কৌঁসুলি প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় আদালতে মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন জানান। ঐ দিনই শুনানির পরে নবম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় মামলা প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করেন। এই মামলা প্রত্যাহার নিয়ে আইনজীবীদের একাংশ অভিযোগ করেছে। আইনজীবী শুভাশিস রায়ের মতে, যে কোন মামলা প্রত্যাহার করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে যে সব বিষয়ে—শুধু সেই মামলা প্রত্যাহার করা যায়। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা হয়নি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ২১শে নভেম্বর তসলিমা নাসরিনের একটি লেখাকে কেন্দ্র করে দুটি মুসলিম সংগঠন রাজ্য অচলের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু অচলাবস্থা সৃষ্টির নাম করে সেদিন কলকাতার রাস্তায় যে হিংসাত্মক তাণ্ডব তারা চালিয়েছিল, তা থামাতে রাজ্য সরকারকে শেষ পর্যন্ত সেনা নামাতে হয়। ঐদিন কলকাতার রিপন স্ট্রিট, মৌলালি, পার্ক সার্কাস, তপসিয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়, গাড়ি-দোকানপাটে আগুন দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের হিংসাত্মক রূপ জনজীবনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। বেশ কিছু স্কুলে ছুটির পরেও ছাত্র-ছাত্রীদের আটকা পড়ে থাকতে হয়। এই তাণ্ডব সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে। কলকাতা পুলিশের তৎকালীন ডিসি (সাউথ) সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন। সাম্প্রতিককালে কলকাতায় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনাটিকে পুলিশ নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে সেনা নামাতে বাধ্য হয়। এরপরেও এন্টালি, পার্ক সার্কাস, তপসিয়া, বেনিয়াপুকুর, কড়েয়া থানা এলাকায় কার্ফু জারি রাখতে হয়েছিল। এই ঘটনার পরেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে তৎকালীন সি.পি.আই. (এম) পরিচালিত রাজ্য সরকার তসলিমাকে এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। সেদিনের হিংসাত্মক ঘটনার পরে পার্ক স্ট্রিট থানা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করে। বিক্ষোভকারী একটি সংগঠনের নেতা ইদ্রিশ আলি সহ ৩২ জনের নামে চার্জশিটও দেয় পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই মামলাটিই শেষ পর্যন্ত তুলে নেওয়া হল কোর্ট থেকে। উল্লেখ্য যে সেদিনের মূল অভিযুক্ত কংগ্রেসের ইদ্রিশ আলি রাজ্য পরিবর্তনের হাওয়ায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।

কিন্তু কেন এই মামলা তুলে নেওয়া হল? সেদিন যারা ভাঙচুর চালিয়ে কলকাতায় আতঙ্ক সৃষ্টি করলো, অসংখ্য গাড়ি ও দোকানপাট ভাঙল, পোড়ালো, লুটপাট চালালো, তাদের অপরাধ ক্ষমারও অযোগ্য। সর্বোপরি পুলিশ প্রশাসনও তাদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ছিল প্রচুর। তাই এই মামলার দোষীদের শাস্তি পাওয়া ছিল খুবই জরুরী। অথচ রাজ্য সরকার মামলাটাই তুলে নেওয়ায় দোষীরা বেকসুর খালাস হয়ে গেল। স্পষ্টতই এই মামলা তুলে নেওয়ার পেছনে একটা উদ্দেশ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই মামলায় অভিযুক্তরা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সংখ্যালঘু তোষণের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি করতে ও সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ককে সুরক্ষিত করতে রাজ্য সরকারের চাপেই এই মামলা প্রত্যাহার। এই মামলায় অভিযুক্তদের অনেকেও বর্তমান তৃণমূলে ঘনিষ্ঠ। তাদেরকে রেহাই দিতেই হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে তাণ্ডব-মামলা।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

যজ্ঞ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন রফিক আহমেদ

রফিক আহমেদ খন্দকার নামে এখন কেউ আর তাকে চিনবে না। পরিচিতদের কাছে রফিক আজ রাজু দাস। ২৬ বছর বয়সের রাজু দাসের এখন নতুন ঠিকানা হিলাড়া কলোনি। বৃহস্পতিবার আসামের পশ্চিম কাটিগড়ায় রাজপুর গ্রামের চক্রবর্তী ঠাকুরবাড়িতে পূজার্চনা ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রফিক হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে। হিলাড়া কলোনির নন্দরানি দাস হিন্দুধর্মে সদ্য আগত রাজুকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে প্রত্যন্ত রাজপুর গ্রামের সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। গ্রামের সকলে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে রাজুকে হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

(সূত্র ঃ দৈনিক যুগশঙ্খ)

ফকিরের হাতে প্রতারিত হয়ে নিঃস্ব দম্পতি

কঠিন রোগে আক্রান্ত মায়ের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না করে ফকিরের শরণাপন্ন হয়ে নিঃস্ব হলেন গড়িয়াহাটের এক দম্পতি। ফকিরবাবাদের ধাপ্পাবাজির ব্যবসা গত কয়েক মাসে রমরমিয়ে বেড়ে চলেছে। প্রায়ই প্রথম সারির সংবাদপত্রে তাদের বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে। শহর ও শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় গজিয়ে উঠেছে তাদের আস্তানা। সাধারণ মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে এদের কাছে যাচ্ছে আর প্রতারিত হচ্ছে। যেমনভাবে গড়িয়াহাটের দম্পতি প্রতারিত হয়েছেন।

ওই দম্পতি জানায়, আগস্ট মাসে তারা সংবাদপত্রে মিঁয়া মুসাজি নামে এক ফকির বাবার বিজ্ঞাপন দেখেন। ওই ফকির নাকি সব রোগ সারিয়ে দিতে পারেন। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কঠিন রোগে আক্রান্ত মা'কে সারিয়ে তুলতে তারা ফকিরের রামগড়ের অফিসে যান। ফকির তাদের রোগ সারানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা ও গহনা চান। সেই মতো তারা ফকিরকে ৪০ হাজার টাকা দেন। বিনিময়ে ফকির একটি তাবিজ দেয়। এরপর ফকির দম্পতিকে গয়না নিয়ে আসতে বলেন শুদ্ধ করার জন্য। ঐ দম্পতি ১৬ই সেপ্টেম্বর গয়না নিয়ে ফকিরের অফিসে গেলে তিনি তা রেখে যেতে বলেন ও পরে আসতে বলেন। কথামতো ঐ দম্পতি পরে গিয়ে দেখে অফিস বন্ধ, ফকির বেপাত্তা। তদন্ত করতে নেমে পুলিশ জানতে পারে ফকিরের আসল বাড়ি আজমেড় শরিফে, রামগড়ে তিনি ভাড়া থাকতেন। এর আগেও বেশ কয়েকজন প্রতারিত হয়েছেন ফকিরের কাছে। নামটিও তার ভাঁড়ানো হতে পারে।

ট্যাক্সি থামিয়ে অপহরণের চেষ্টা দুই তরুণীকে

গত ২২শে সেপ্টেম্বর রাত পৌনে একটা নাগাদ ট্যাক্সি থামিয়ে দুই তরুণীকে অপহরণের চেষ্টা করলো দুষ্কৃতিরা। ঘটনাস্থল ক্যানাল ওয়েস্ট রোড ও নারকেলডাঙা মেন রোডের মোড়। পুলিশ জানায়, রবিবার রাতে ঘটনার পরেই নারকেলডাঙার পুলিশ পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। ট্যাক্সিচালক ও দুই তরুণীকে নিয়ে পুলিশ থানায় আসে। এক তরুণী পুলিশকে জানায়, জোর করে তাদের গাড়িতে উঠে পড়েছিল ঐ যুবক। ট্যাক্সিচালকও একই অভিযোগ করে বলে যে ছেলেটি বলেছিল, সে যেখানে বলবে, সেখানে যেতে হবে। তার সঙ্গে ছিল আরও দুই যুবক। তারা মোটরসাইকেল নিয়ে ট্যাক্সির সামনে সামনে যাচ্ছিল।

অভিযোগ মত থানার টহলরত পুলিশকর্মীরা যুবকদের খুঁজতে শুরু করে। রাত আড়াইটে নাগাত নারকেলডাঙার কসাই বস্তি থেকে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ আখতার ওরফে টিপু ওরফে দুলারা, মহম্মদ হাসনেন এবং মহম্মদ আসলাম ওরফে সানি। তাদের বয়স কুড়ি-বাইশ। তাদের বিরুদ্ধে অপহরণ ও শ্লীলতাহানির মামলা হয়েছে। সোমবার ধৃতদের শিয়ালদহের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয়

পত্রিকা দপ্তর থেকে

ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ রাইয়ের আদালতে হাজির করানো হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

দমদম ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দা বছর কুড়ির ঐ তরুণী পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানায়, তিনি ও তার বোন চায়না টাউনে একটি পানশালায় গান করেন। রবিবার রাত ১২টা নাগাদ তারা এক পুরুষ কর্মীর সঙ্গে ট্যাক্সি ভাড়া করে বাড়ি ফিরছিলেন। পুরুষ কর্মীটি রাজাবাজারে এক মেসে থাকে। সে সেখানে নেমে যায়। এরপর ট্যাক্সি ক্যানাল ইস্ট রোড ধরে কিছুটা যেতেই তিন যুবক তাদের পথ আটকায় ও তাদের একজন জোর করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। তরুণীর অভিযোগ— যুবকটি চালককে বলে, ম্যায় যাঁহা লে যানা চাতা হু, ওহি চলিয়ে। নেহি তো গোলি কর দুঙ্গা। মেয়েদুটি মোবাইলে বন্ধুদের ফোন করলে ছেলেটি বলে ফোন করে কোন লাভ নেই। তাদের সঙ্গে পনেরো মিনিট কথা বলতে চায় সে। ইতিমধ্যে ট্যাক্সি চালক গাড়ি থামিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ করলে যুবকটি পালিয়ে যায়।

এদিন অভিযুক্তদের আইনজীবী প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায় ও বরুণ দত্ত আদালতে জানায়, পুলিশ অপহরণ ও শ্লীলতাহানির মামলা করলেও লিখিত অভিযোগে তরুণী অপহরণ এবং শ্লীলতাহানির কথা জানায়নি।

কীভাবে ধরা পড়ল অভিযুক্তরা? পুলিশের দাবি, দুই তরুণী ও চালকের কাছে অভিযুক্তদের চেহারার বর্ণনা শুনে পরিচিত দুষ্কৃতিদের ছবি দেখানো হয় তাদের। তারমধ্যে টিপুর ছবি দেখে চালক জানায়, ওই যুবকই গাড়িতে জোর করে উঠে বসেছিল। সনাক্তকরণ হতেই প্রথমে টিপু এবং পরে বাকি দু'জনকে গ্রেপ্তার হয়।

ধর্ষিতা সপ্তম শ্রেণীর কিশোরী ছাত্রী

দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্তিতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী চোদ্দ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যাবেলা উস্তি থানা এলাকায় এই জঘন্য ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত আসগার আলি শেখ পলাতক। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া জানান যে, আসগারের নামে ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ উস্তি থানার পুলিশ প্রথমে ধর্ষণের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। পরে অবশ্য জনতার প্রবল বিক্ষোভের জেরে চাপে পড়ে এফ.আই.আর দায়ের করতে বাধ্য হয়।

নিগৃহীতা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীটির বাড়ি উস্তি থানার অন্তর্গত হরিহরপুর এলাকায়। মেয়েটি কেশিলিয়া ইন্দ্রজিয়া হাইস্কুলের ছাত্রী। তার বাবার দাবি স্কুল বা কোচিং ক্লাসে যাওয়ার পথে তার মেয়েকে প্রায়ই উত্যক্ত করতো বছর পঁচিশের আসগার। এ ব্যাপারে মেয়েটি বাড়িতে জানালে তার বাবা-মা আসগারকে বকাবকিও করেছিল।

সোমবার (২৩-৯-২০১৩) সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বারান্দায় বসে পড়ছিল ঐ কিশোরী। কাছেই তার মা তার বাবাকে খেতে দিচ্ছিল। এই সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যায়। তখন রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় ঐ কিশোরী। আলো আসার পরও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি খালের পাশে ঝোপের মধ্যে মেয়েটিকে রক্তাক্ত এবং অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। মেয়েটি পরে জানায় তার এই অবস্থার জন্য আসগারই দায়ী। ঘটনার পর থেকেই অঞ্চল থেকে আসগার পলাতক।

দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত সাধারণ হিন্দু

হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন মাখন সরকার

১৯শে সেপ্টেম্বর মাখন সরকার (৪৭ বছর) (আমডোব গ্রামের নিবাসী, বাগদা থানা, উত্তর ২৪ পরগণা) রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ হেলেঞ্চা বাজার থেকে বাউল গান শুনে নিজের অটো চালিয়ে ফিরছিল। যখন সে আসছিল তখন মালিপোতা ধুতড়াবেড়িয়া অঞ্চলে তারই চারজন প্রতিবেশী তাকে অটো থামাতে বলে। যখন সে অটো থামাবার কারণ তাদের কাছে জানতে চায় তখন তারা মাখনবাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় তাকে মেরে ফেলার মতো অবস্থা করে। ঐ চারজন হল বাকিবিল্লা মন্ডল (পিতা কৌসের আলি মন্ডল), শরমস্উদ্দিন মন্ডল (পিতা রেজ্জাক মন্ডল), মাফিজুল মোল্লা (পিতা সোয়েদ আলি মোল্লা), রাজান আলি মীর (পিতা মইনুদ্দিন মীর)।

পরে জানা যায় এই আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত। মাখনবাবুর সঙ্গে তাদের কোন বচসা হয়নি বা তারা মাখনবাবুর টাকা-পয়সা লুটপাটও করেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল মাখন সরকারকে খুন করে তার অটোরিক্সাটা হাতানো। তারা মাখনবাবুকে অটো

পত্রিকা দপ্তর থেকে

থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারতে থাকে। তার দুটো চোখই দারুণভাবে জখম হয় এবং বুকে ও কাঁধে চোট লাগে। চোখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকলেও দুষ্কৃতিরা সেই অবস্থাতেও মাখনবাবুকে মারতে থাকে। দুষ্কৃতিদের একজন মাখন সরকারের গলা ধরে তারে শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টা করলে তিনি শেষবারের মতো বাঁচার চেষ্টায় তাকে ছাড়িয়ে প্রাণপণে চিৎকার করতে থাকে। তার চিৎকার শুনে আশপাশ থেকে বেশ কয়েকজন ছুটে আসে। তাদের মধ্যে রঞ্জন মল্লিক (পিতা বিজয় মল্লিক), পিন্টু সরকার (পিতা কার্তিক সরকার) সহ বেশ কিছু লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। বিপদের আশঙ্কা দেখে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার আগে তারা মাখন সরকারের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং অটোর সামনের কাঁচ ভেঙে দেয়।

মাখন সরকারকে উপস্থিত লোকেরা দ্রুত বাগদা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার চিকিৎসাও ডাক্তাররা তাড়াতাড়ি শুরু করে কিন্তু আশঙ্কাজনক অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। এতবড় ঘটনার পরও পুলিশে জানালে বাগদা থানা ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব দিয়ে চায়নি। যদিও পরে সামান্য একটা ডায়েরি করেছে। এই সাধারণ ডাইরিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। হিন্দু সংহতির স্থানীয় কার্যকর্তারা পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে এই ঘটনার এফ. আই. আর করা কতটা জরুরী। পুলিশকে জানানো হয় যে মালিপোতা জায়গাটা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য কুখ্যাত এবং মাঝে মাঝেই ওখানে র‍্যাফ নামানো হয়। তখন পুলিশের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত বাগদা থানা একটা এফ.আই.আর (নং ৬২৮, আন্ডার সেকশন ৩৪১, ৩২৫, ৩৭৯, ৪২৭, ৩৪৯ আই.পি.সি.) ধারাতে দায়ের করা হয় সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। মাখন সরকার এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা
দুষ্কৃতিদের উচিৎ শিক্ষা দিল এলাকাবাসী

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপের উকিলবাজারে লক্ষ্মী ঘড়ুই-এর মদের দোকানে কিছু মুসলিম ছেলে মদ খেয়ে অসভ্যতা করলে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা দেখা যায়। তারা লক্ষ্মী ঘড়ুই এবং তার মেয়ে অষ্টমী ঘড়ুই (১৩ বছর)-এর সঙ্গে অশোভন আচরণ করে। তাদের চিৎকারে এলাকায় লোক জড়ো হয়ে যায়। জনসাধারণ দুষ্কৃতিদের মারধোর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

এই ঘটনার পিছনে আছে তার আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার উকিলবাজারে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। ঐ দিন প্রীতিলতা মাইতি নামে একটি মেয়ে উকিলবাজারে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। এই অ্যাক্সিডেন্টকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এই গাড়িগুলো হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ছিল। এরপর উত্তেজিত জনতা একটি মেশিনভ্যান ভাঙে যার মালিক এক মুসলমান। এই নিয়ে তাদের লোকজন প্রতিবাদ করে। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা যেহেতু অ্যাক্সিডেন্টকে কেন্দ্র করে হয়েছে তাই পুলিশ ব্যাপারটা মিটমাট করে দেয়।

এর পরদিন অর্থাৎ শনিবার কিছু মুসলিম যুবক এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে পরিকল্পনা করে লক্ষ্মী ঘড়ুই-এর মদের দোকানে (দোকানটি অবৈধ) মদ খেতে আসে। মদ খাওয়ার পর তারা লক্ষ্মী ঘড়ুই-এর সঙ্গে অশ্লীল ব্যবহার করে। তার ১৩ বছরের মেয়ে অষ্টমীর হাত ধরে টানাটানি করে। তাকে বলে তুই আমাদের সমাজে চল, তোকে বিয়ে করবো। অষ্টমী বাধা দিলে তারা তাকে জোর জবরদস্তি তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। তখন অষ্টমী ও তার মা লক্ষ্মী চিৎকার করলে লোক জড়ো হয়ে যায়। সব শোনার পর তারা দুষ্কৃতিদের মারধোর করে। তখন বিশালক্ষ্মীপুর বস্তিপাড়া থেকে বেশ কিছু লোক দুষ্কৃতিদের বাঁচাতে আসে। তারাও জনতার ক্ষোভের মুখে পড়ে মার খেয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ এসে অভিযুক্ত তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এলাকার লোকজনের কথায়, এদের মধ্যে একজন কাকদ্বীপের অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ধনী আখতারউদ্দিনের আত্মীয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, এই আখতারউদ্দিন অর্থের জোরে বেশ কিছু দুষ্কৃতি পুষে রেখেছে। মাঝে মাঝেই এরা এলাকায় দুষ্কর্মমূলক কাজ করে বেড়ায়। আশ্চর্যজনকভাবে পরদিনই তিন দুষ্কৃতি কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে যায়। এ ব্যাপারে এলাকার ও সাধারণের মধ্যে ক্রমেই ক্ষোভ বাড়ছে। হিন্দুরা প্রশাসনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

(১)

১৯শে মে, ২০১৩ বাংলাদেশের মানিকগঞ্জের কাওয়ারবিল গ্রামে একটি স্থানীয় কালীমন্দিরে মুসলমান দুষ্কৃতিরা আগুন ধরিয়ে দেয়। কালীমায়ের বিগ্রহটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। এছাড়াও অন্যান্য যে দেবী-দেবীর মূর্তি ছিল সেগুলো কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মানিকগঞ্জের এস.পি. আহিরুদজ্জামান এলাকা পরিদর্শন করে যান। কিন্তু কোন দুষ্কৃতিকে প্রশাসন গ্রেপ্তার করেনি। তারা বুক ফুলিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলতঃ আরও বড় বিপদের সম্ভাবনায় কাওয়ারবিলের হিন্দুরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

(২)

৩১শে মে ২০১৩ দুপুরবেলা ভোলা জেলার, লর্ড হার্ডিঞ্জ এলাকায় কিছু মুসলিম দুষ্কৃতি অকারণেই স্থানীয় একটি হিন্দুদের মন্দির আক্রমণ করে ভাঙচুর চালায়। তারা মন্দিরের সমস্ত বিগ্রহ ভেঙে দেয় এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় হিন্দু কিরণচন্দ্র দাস, ববিতা দাস ও ঝর্ণারাণী দাস বাধা দিতে গেলে তাদের ব্যাপক মারধোর করে দুষ্কৃতিরা। প্রশাসনকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি।

(৩)

১৪ই জুন, ২০১৩ বাংলাদেশের যশোর জেলা শহর অঞ্চলে রাত ১১টা নাগাদ এক মুসলিম দুষ্কৃতিদল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ঢুকে দুজন সন্ন্যাসীকে ব্যাপক মারধোর করে তাদের হাত ভেঙে দেয়। এরপর লোহার গেট ভেঙে তারা ভেতরে ঢুকে বাসনপত্র, গয়নাগাটি ও ডোনেশন বাক্সটি পর্যন্ত তুলে নিয়ে যায়। এই নারকীয় আক্রমণের ফলে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে।

(৪)

২৮শে মে ২০১৩ কিশোরগঞ্জ জেলা (উপজেলা ঃ হোসেনপুর) একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতি বিখ্যাত কুলেশ্বরী মন্দিরে ঢুকে রাধাকৃষ্ণের পবিত্র মূর্তি ধ্বংস করে দেয়। এছাড়াও মন্দিরের অন্যান্য অংশ অস্ত্র দিয়ে ভাঙচুর করে। পুলিশ এসে বিষয়টি দেখে গেলেও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। এলাকার হিন্দুরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

২৪ দিনে ৩১৯টি মন্দির বাড়ি-দোকানে হামলা

২৪ দিনে ৩১৯টি মন্দির, বাড়ি ও দোকানে হামলা

Horrible reflection of the plight of tortured BD Hindus in Bangladesh newspaper, though partial.

পত্রিকা দপ্তর থেকে

বাংলাদেশে এবার ১০টি দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর, আটক ২

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে এই মূর্তি ভেঙে ফেলে দুষ্কৃতীরা।

আনোয়ারুল করিম রাজু

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর : বাংলাদেশে বৌদ্ধদের মঠ ও হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনার রেশ কাটিয়ে না কাটাতেই এবার বুধবার দুইটি জেলায় দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এবার ঢাকার পাশেই বিক্রমপুরের মুন্সিগঞ্জ এলাকার সিরাজদিখানে ৬টি এবং দক্ষিণের জেলা নড়াইলের লোহাগড়ায় ৪টি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার দায়ে নড়াইলে ২জনকে আটক করা হলেও মুন্সিগঞ্জের ঘটনায় কাউকে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আটক করা যায়নি বলে পুলিশ সূত্রের খবর। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দুর্গাপূজার সময় হিংসা আশঙ্কা প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা পরই এই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল। সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সারা দেশের প্রশাসনকে কঠোর নজরদারি করার নির্দেশের পরও এই ঘটনা ঘটায় দুর্ভাবনা। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছেন বাংলাদেশের সরকারি জোটের

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মাহবুবুর রহমান জানান, বুধবার ভোররাতে সিরাজদিখান উপজেলার ছোট সিরাজপুর গ্রামের বটতলা মণ্ডপে কে বা কারা হামলা চালিয়ে দুর্গাপূজার জন্য তৈরি হতে থাকা ৬টি প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। সিরাজদিখানের বটতলা পূজা কমিটির সভাপতি [illegible] চক্রবর্তী বলেন, 'মঙ্গলবার রাত ২টা পর্যন্ত মণ্ডপে প্রতিমা তৈরির কাজ করে সবাই ঘুমাতে চলে যায়। ভোর ছ'টার দিকে অন্য কয়েকজন এসে দেখে প্রতিমাগুলো ভাঙচুর করা হয়েছে। মা দুর্গার মাথা পড়ে আছে পায়ের কাছে। ঘটনা তদন্ত করা হয়েছে।'

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আবুল কাশেম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, বটতলা মণ্ডপে পূজা আয়োজন করতে ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তিগুলো সরকারি উদ্যোগে মেরামত শুরু হয়েছে। সিরাজদিখান থানার ওসি জানান, যারাই করুক না কেন তাদের [illegible]

[illegible] হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য মণ্ডপের নিরাপত্তায় জোরদার করা হয়েছে। [illegible]

দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার [illegible] ঠাকুরবাড়ি মন্দিরে মঙ্গলবার রাতে হামলা চালিয়ে দুর্গা সহ ৪টি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। [illegible] আটক করেছে পুলিশ। [illegible]

কক্সবাজার দাঙ্গার প্ররোচক কম্প্যুটার ছাত্র, গ্রেফতার চট্টগ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৩ অক্টোবর : [illegible]

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী চিন্তাবিদ

''শিবপ্রসাদ রায়ের''

অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ। অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকাশক ঃ তপন কুমার ঘোষ

সব বুক স্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশনী

১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩

ফোনঃ ২৩৬০-৪৩০৬, মোঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

পত্রিকা দপ্তর থেকে

২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা এবং ৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের জনসংখ্যা ঃ শতাংশে

জেলা	ধর্ম	মোট জনসংখ্যার শতাংশ	শিশুদের (০-৬ বৎসর) সংখ্যার শতাংশ
দার্জিলিং	হিন্দু	৭৬.৯২	৭৬.১৯
	মুসলিম	৫.৩১	৮.২৬
জলপাইগুড়ি	হিন্দু	৮৩.৩০	৮০.৪৫
	মুসলিম	১০.৮৫	১৩.৮১
কুচবিহার	হিন্দু	৭৫.৫০	৬৯.৮২
	মুসলিম	২৪.২৪	২৯.৯৮
উত্তর দিনাজপুর	হিন্দু	৫১.৭২	৪৩.১৯
	মুসলিম	৪৭.৩৬	৫৫.৯৩
দক্ষিণ দিনাজপুর	হিন্দু	৭৪.০১	৬৯.৪০
	মুসলিম	২৪.০২	২৮.৩৫
মালদহ	হিন্দু	৪৯.২৮	৪৩.০১
	মুসলিম	৪৯.৭২	৫৬.০৮
মুর্শিদাবাদ	হিন্দু	৩৫.৯২	২৯.৩৫
	মুসলিম	৬৩.৬৭	৭০.২৭
বীরভূম	হিন্দু	৬৪.৪৯	৫৮.৪২
	মুসলিম	৩৫.০৮	৪১.১৫
বর্ধমান	হিন্দু	৭৮.৮৯	৭৫.০৩
	মুসলিম	১৯.৭৮	২৩.৬২
নদীয়া	হিন্দু	৭৩.৭৫	৬৬.৭১
	মুসলিম	২৫.৪১	৩২.৫৫
উত্তর ২৪ পরগণা	হিন্দু	৭৫.২৩	৬৫.৫২
	মুসলিম	২৪.২২	৩৪.০১
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	হিন্দু	৬৫.৮৬	৫৫.৪১
	মুসলিম	৩৩.২৪	৪৩.৮৫
হুগলী	হিন্দু	৮৩.৬৩	৭৮.৯৪
	মুসলিম	১৫.১৪	১৯.৫৩
বাঁকুড়া	হিন্দু	৮৪.৩৫	৮১.৮০
	মুসলিম	৭.৫১	১০.০৯
পুরুলিয়া	হিন্দু	৮৩.৪২	৮১.৬২
	মুসলিম	৭.১২	৯.২৬
মেদিনীপুর	হিন্দু	৮৫.৫৮	৮১.৩৬
	মুসলিম	১১.৩৩	১৫.৩৬
হাওড়া	হিন্দু	৭৪.৯৮	৬৪.৮১
	মুসলিম	২৪.৪৪	৩৪.৬৮
কলকাতা	হিন্দু	৭৭.৬৮	৭০.২৪
	মুসলিম	২০.২৭	২৭.৮১
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ	**হিন্দু**	**৭২.৪৭**	**৬৪.৬১**
	মুসলিম	২৫.২৫	৩৩.১৭

সূত্র ঃ ভারত সরকার প্রকাশিত 'সেন্সাস রিপোর্ট-২০০১'

পত্রিকা দপ্তর থেকে

ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা ঃ পশ্চিমবঙ্গে জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন

জেলা	সাল	হিন্দু	কমেছে	মুসলিম	বেড়েছে
দার্জিলিং	১৯৫১	৮১.৭১	— ৪.৭৯	১.১৪	+ ৪.১৭
	২০০১	৭৬.৯২		৫.৩১	
জলপাইগুড়ি	১৯৫১	৮৪.১৮	— ০.৮৮	৯.৭৪	+ ১.১১
	২০০১	৮৩.৩		১০.৮৫	
কুচবিহার	১৯৫১	৭০.৯০	+ ৪.৬ বেড়েছে একমাত্র ব্যতিক্রম	২৮.৯৪	— ৪.৭ কমেছে একমাত্র ব্যতিক্রম
	২০০১	৭৫.৫০		২৪.২৪	
উত্তর দিনাজপুর	১৯৮১	৫৪.২০	— ২.৪৮	৪৫.৩৫	+ ২.০১
	২০০১	৫১.৭২		৪৭.৩৬	
দক্ষিণ দিনাজপুর	১৯৮১	৭৫.৩২	— ১.৩১	২৩.৫১	+ ০.৫১
	২০০১	৭৪.০১		২৪.০২	
মালদহ	১৯৫১	৬২.৯২	— ১৩.৬৪	৩৬.৯৭	+ ১২.৭৫
	২০০১	৪৯.২৮		৪৯.৭২	
মুর্শিদাবাদ	১৯৫১	৪৪.৬০	— ৮.৬৮	৫৫.২৪	+ ৮.৪৩
	২০০১	৩৫.৯২		৬৩.৬৭	
বীরভূম	১৯৫১	৭২.৬০	— ৭.৯১	২৬.৮৬	+ ৪.২২
	২০০১	৬৪.৬৯		৩৫.০৮	
বর্ধমান	১৯৫১	৮৩.৭৩	— ৪.৮৪	১৫.৬০	+ ৪.১৮
	২০০১	৭৮.৮৯		১৯.৭৮	
নদীয়া	১৯৫১	৭৭.০৩	— ৩.২৮	২২.৩৬	+ ৩.০৫
	২০০১	৭৩.৭৫		২৫.৪১	
উত্তর ২৪ পরগণা	১৯৭১	৭৭.২৬	— ২.০৩	২২.৪৩	+ ১.৭৯
	২০০১	৭৫.২৩		২৪.২২	
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১৯৭১	৭২.৯৬	— ৭.১	২৬.০৫	+ ৭.১৯
	২০০১	৬৫.৮৬		৩৩.২৪	
হুগলি	১৯৫১	৮৬.৫২	— ২.৮৯	১৩.২৭	+ ১.৮৭
	২০০১	৮৩.৬৩		১৫.১৪	
বাঁকুড়া	১৯৫১	৯১.১৬	— ৬.৮১	৪.৪০	+ ৩.১১
	২০০১	৮৪.৩৫		৭.৫১	
পুরুলিয়া	১৯৬১	৯৩.১৩	— ৯.৭১	৫.৯৯	+ ১.১৩
	২০০১	৮৩.৪২		৭.১২	
মেদিনীপুর	১৯৫১	৯১.৭৮	— ৬.২	৭.১৭	+ ৪.১৬
	২০০১	৮৫.৫৮		১১.৩৩	
হাওড়া	১৯৫১	৮৩.৪৫	— ৮.৪৭	১৬.২২	+ ৮.২২
	২০০১	৭৪.৯৮		২৪.৪৪	
কলকাতা	১৯৫১	৮৩.৪১	—৫.৭৩	১২.০০	+ ৮.২৭
	২০০১	৭৭.৬৮		২০.২৭	
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ	১৯৫১	৭৮.৪৫	— ৫.৯৮	১৯.৮৫	+ ৫.৪
	২০০১	৭২.৪৭		২৫.২৫	

পত্রিকা দপ্তর থেকে

কেনিয়ার মলে জঙ্গী হামলা

অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখলো সারা বিশ্ব

গত ২১শে সেপ্টেম্বর কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি-এর একটি শপিং মলে বর্বরোচিত ইসলামিক জঙ্গী হানায় কমপক্ষে ৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের তালিকাটাও কম নয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কমপক্ষে দশজন জঙ্গী ছিল। তাদের মধ্যে মহিলাও আছে। ঐ দিন শপিং মলটিতে একটি অনুষ্ঠান চলছিল। তখনই আক্রমণ চালায় জঙ্গীর দলটি। এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে তারা মানুষ খুন করতে থাকে। জঙ্গীদের গুলির নিশানা থেকে শিশু ও মহিলারাও রক্ষা পায়নি। শপিং মলের সুদৃশ্য ফ্লোর রক্তে লাল হয়ে ওঠে। নারী, শিশু ও সাধারণ মানুষের চিৎকারে মলের ভিতরে তখন এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণভয়ে মানুষ উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে পুলিশের পাশাপাশি সৈন্যবাহিনীও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। মলের ভেতর অনেকে আটকে পড়ায় উদ্ধারের কাজ ব্যাহত হয়। নিরাপত্তারক্ষীদের প্রতিটা পদক্ষেপ অত্যন্ত সাবধানে নিতে হচ্ছিল। কেননা, তখন তারা মলের ভেতরে গুলি চালানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। পুলিশ-সেনাবাহিনীদের সঙ্গে জঙ্গীদের দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াইয়ের কথা জানতে পারা গেছে।

কিন্তু কিসের জন্য কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে ওয়েস্ট গেট নামক শপিং মলে তাণ্ডব চালালো জঙ্গীরা। নিজেদের কোন দাবিদাওয়া, মুক্তিপণ, স্বাধীনতা—না এর কোনটাই নয়। তবে? জঙ্গীরা ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইসলামিক জেহাদ সৃষ্টি করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। জঙ্গীদের নাকি কোন পরিচয় হয় না, তারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় না---তাদের একটাই পরিচয় তারা জঙ্গী। কিন্তু মুসলিম জঙ্গীদের মধ্যে সম্প্রদায়গত ভ্রাতৃত্ববোধ আছে। প্যান ইসলামিজম্-এ তারা বিশ্বাসী। জঙ্গীদের কথার মধ্যেই তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলিম জঙ্গীরা মলের মধ্যে আটক

ব্যক্তিদের ধর্মীয় পরিচয় জানতে চায়। জনতার মধ্যে যারা মুসলিম তাদের চলে যেতে বলে জঙ্গীরা। প্রত্যক্ষদর্শী একজন জানায়, জঙ্গীরা বলে যে যারা মুসলমান তারা যেন এগিয়ে আসে। বেশ কিছু লোক এগিয়ে এলে জঙ্গীরা তাদের ইসলাম সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুর মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করে। বলাবাহুল্য যারা উত্তর দিতে পারেনি তাদেরকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় জঙ্গীরা। অর্থাৎ অ-মুসলমান মাত্রই মুসলমানদের কাছে কাফের। তাদের নারী শিশুও ঘৃণ্য। তাই নির্বিচারে তাদেরকে হত্যা করতে কোন বাধা নেই। এই নিহতদের মধ্যে দুজন ভারতীয় হিন্দুও আছে—৪০ বছরের শ্রীধর নটরাজন ও ৮ বছরের পরমাংশু জৈন।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাবিশ্বে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে সর্বত্রই ধিক্কার রব উঠেছে। ইসলামি জঙ্গীদের কাছে অ-ইসলামিদের প্রাণের কোন মূল্য নেই। তাদেরকে হত্যা করে সারাবিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা, এটাই তাদের লক্ষ্য। সারা বিশ্বের এই ঘটনা থেকে ইসলাম সম্পর্কে নতুন করে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012

বিশ্ববিখ্যাত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক, ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ, প্রবাদপ্রতিম ডাঃ পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়,
যিনি পি. ব্যানার্জী নামে খ্যাত, হিন্দু সংহতি-কে তাঁর আশীর্বাণী পাঠিয়েছেন। তাঁর স্বাক্ষরিত পত্রটি এখানে প্রকাশ করা হল।

বাংলার জনসাধারনকে আমার বিনম্র নিবেদন

তারিখ ঃ ১ অক্টোবর ২০১৩

আমাদের দেশ বর্ত্তমানে অতি সংকটময় অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের মানুষ এই সংকট বুঝতে পারছেনা বলে মনে হয়। কিন্তু সেই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ কাটিয়ে ওঠার জন্য কিছু মানুষ আপ্রান চেষ্টা করছেন বটে তবে সাধারন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগানোর জন্য অনেক বেশি প্রচেষ্টা দরকার। যাঁরা এই চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে থেকে একটা মূল্যবান সংগঠন হোল 'হিন্দু সংহতি' । তাঁদের মধ্যে শ্রী তপন কুমার ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে এই সংগঠন যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। আমার জীবনে ১৯৪৬-৪৭ সালের ভয়ঙ্কর দিন গুলি দেখার সুযোগ হয়েছিল। তখন থেকেই আমার চিন্তাধারা কেন্দ্রিভূত হয় দেশের বিপদ সংকুল অবস্থা থেকে এই গরীমা মন্ডিত হিন্দু জাতীর রক্ষার উপায় খোঁজার।

কালক্রমে দেখা গেল বহু সংস্থার উদ্ভব হচ্ছে এই একই চিন্তার উৎস থেকে। আমি আমার বাস্তব বাদী চিন্তা ধারায় বিশ্লেষন করে দেখলাম সব সংস্থাই কালের গতিতে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে বা বিচ্যুত হচ্ছে তাদের মূল আদর্শ থেকে। আমি কিন্তু নিরাশ হইনি কারণ এই উত্থান ও পতন মানুষের ধর্ম। এবার কিন্তু আর আমাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া ঠিক হবেনা। কারণ অসুরের সঙ্গে আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তিগুলি মিশে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে।

ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতি অতীতেও একবার ভয়াবহ রুপ নিয়েছিলো এবং দেশের যত চিন্তাশীল, মঙ্গলকারী শক্তিগুলি সব পরাস্ত হয়ে যাচ্ছিলো। বাঁচার আর কোনও উপায় ছিলো না। সেই সংকটময় অবস্থায় দেশের সব মঙ্গলকারী শক্তিগুলো গোপনে এক বিশাল সমাবেশ করে হিমালয়ের এক উচ্চস্থানে যেখানে সহজে যাওয়া যায় না। দেশের এই মঙ্গলকারী শক্তিগুলি কি? আমি যখন বেদ পড়াতাম তখন এই নিয়ে প্রচুর গবেষনা করে ঐ ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করেছিলাম। ঐ শক্তিগুলি আর কেউ নয়- তারা হচ্ছে সমাজের মধ্যে থাকা কিছু পেশাগত মানুষ- যেমন স্কুল-কলেজের শিক্ষক, বিচারকগন,পুলিশ,ডাক্তার, উকিল,সেনানী, স্ত্রী সমাজ বা মাতৃকুল, বা যারাই সমাজে মানুষের মধ্যে আকর্ষন যোগ্য, চিত্রতারকা, ক্রীড়াজগতের শ্রেষ্ঠ লোকেরা সাধুসমাজ ইত্যাদি। এদের মধ্যে আমাদের শক্তি বিস্তৃত আছে।

সেই শক্তিগুলিকে আমাদের আবার অতি গোপনে একত্রিত করে প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজের মধ্য এই অসুর নাশের কাজে লাগতে হবে। ঠিক এই ভাবেই প্রাচীনকালে এই শক্তিগুলিকে হিন্দু বা বৈদিক ধর্মী লোকেরা দেবশক্তি রূপে বর্ননা করেছিলেন। যেমন শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কৃষ্ণনারায়ন, ইন্দ্র, বরুন ইত্যাদি। যখন দেশে অসুর শক্তি প্রভাবশালী হোল তখন কিন্তু ঐ সব দেবশক্তিরাও কিছুই করতে পারেনি তাদের বিনাশ করতে। এবং শিব বা নারায়ণও কিছুই করতে পারেননি তাঁদের একক ক্ষমতায়। তখনই তাঁরা সমাবেশ করেন অতি গোপনে দূর্গম হিমালয়ের উচ্চতম স্থানে উত্তরাখন্ডে। তাঁদের সবার শক্তি একযোগে সঞ্চিত করে আবার দেশের নিজ নিজ স্থানে থেকে সাংঘাতিক চেষ্টা চালানো হয়। সেই জন্য সেই সমন্বিত শক্তিকে আমরা দূর্গারূপ বর্ণনা করেছি। তাই দূর্গার হাতে সব দেবতাদের নিজ নিজ অস্ত্র দিয়ে শক্তিশালী করা হয়। দশ হাত সেই জন্যই
দশ রকম অস্ত্র দিয়ে শক্তিশালী করা হয়। দশ হাত সেই জন্যই দশরকম অস্ত্রে সজ্জিত হয়েছিলো। কারণ যতবড়ই শক্তি দেবতাদের থাকুকনা কেন কারুর পক্ষেই ঐ অসুরদের বিনাশ করা যায়নি।

আজ আমাদের সেই অসুর পরিবেষ্টিত সময়ে যাঁরাই এই প্রচেষ্টা করবে তাঁদেরই আমাদের উচিত একযোগে অতি অতি গোপনে সাহায্য করা। আজকের 'হিন্দুসংহতিও' দূর্গার বহুরূপের একটা। আমাদের হাতে সময় আর বেশীদিন নাই। আমাদের যার যা সামর্থ্য, অর্থ, লোকবল, আইনের বল, প্রশাসনিক শক্তি, রাজনৈতিক শক্তি,শিক্ষাজগতের শক্তি, নারীশক্তি, এবং আর যা যা আছে তাই দিয়ে হয় সামনাসামনি অথবা আড়াল থেকে গোপনে অবিলম্বে একত্রিত হওয়ার দিন এসেছে। আর দেরি নয়।

বিনীত

শ্রী পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের সংকল্প

- হিন্দুস্থান থেকে হিন্দুদের স্থানচ্যুত হতে দেব না।
- হিন্দুর উপর অন্যায়, অত্যাচার ও অপমান মেনে নেব না।
- হিন্দু মা-বোনের সম্মান প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।
- হিন্দু বোনদের আমাদের ধর্মের বাইরে হারিয়ে যেতে দেব না।
- আমাদের দেব-দেবী ও মন্দির প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।
- হিন্দুর জনসংখ্যা কমতে দেব না।
- বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দেব না।

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা মাত্র